শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীচরণকমলেষু

এই লেখকেরই

অসমতল

হলদে বাড়ী

দ্বীপপুঞ্জ

উল্টোরথ

বেলা ন'টা বাজতে না বাজতেই খেতে এল প্রিয়লাল।

স্থবর্ণ তখনো বঁটিতে মাছ কুটছে।

প্রিয়লাল বলল, 'কতদূর হোল স্থবর্ণ ?'

স্থবর্ণ বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, 'এই তো কেবল ন'টা বাজল। আর বাজার ক'রে দিয়ে গেলেন তো মাত্র মিনিট পনের আগে। কতদূর হোল দেখতে পাচ্ছেন না ?'

ঝাঁজ আছে স্থবর্ণের গলায়।

স্থবর্ণের মা নিভাননী ব'সে ব'সে শাক বাছছিলেন। মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, আহাহা, কথার ছিরি দেখ মেয়ের। একেবারে ঘণ্টা মিনিট হিসাব করে দিচ্ছে। যেন ঘড়ি একটা ওর বাঁধা আছে হাতে। তাড়াতাড়ি আয় হাত চালিয়ে। যাও বাবা তুমি গিয়ে ব'সো। বেশি দেরি লাগবে না।'

ঘরের মধ্যে হাত পাঁচ ছয়েক মাত্র জায়গা। তার প্রায় বারো আনিই প্রিয়লালের তক্তপোষখানা জুড়ে রয়েছে। কিন্তু তক্তপোষে গিয়ে আজ আর বসল না প্রিয়লাল। দেয়ালে ঝুলানো খান-কতক পুরোন শাড়ি একেবারে ছিঁড়ে যাওয়া একটা পাটিকে টুকরো-টুকরো ক'রে স্থবর্ণ আসন বানিয়েছে। প্রত্যেকটা আসনের ঠিক এক জায়গায় মোচড়ানো আর প্রায় গোটা তিন চারি ক'রে ফুটো আছেই। পুরোন শাড়ির রঙীণ পাড় ছিঁড়ে স্থবর্ণ সযত্নে মুড়ে দিয়েছে। তারই একখান আসন পেড়ে নিয়ে ঘরের মেঝেতে উঠানের দিকে মুখ করে প্রিয়লাল ব'সে পড়ল। এখান

থেকে সম্পূর্ণ দেখা যায় স্বর্ণকে। কিন্তু শুধু দেখলেই তো মন ভরে না, দেখা দিতেও সাধ যায়।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে থেকে প্রিয়লাল আবার তাড়া দেয়, 'মাছের আমার দরকার নেই। যা হয়েছে তাই দিয়েই দাও আমাকে।'

স্বর্ণ আবার বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'সব সময় অমন যদি ঘোড়ায় চড়ে থাকেন আমার দ্বারা হবে না আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।'

নিভাননী এবারও ধমক দেন, 'কথার ছিরি দেখ। তোর জন্ত বাছা কি শেষে আফিস কামাই করবে না কি ?'

স্বর্ণ বলে, 'অত যদি দরদ, নিজে এসে রেঁধে বেড়ে দিলেই পারো, আমার দ্বারা হবে না।'

নিভাননী বলেন, 'না তা হবে কিসের। রাজনন্দিনীর দেমাকে আর পা পড়ে না মাটিতে।'

প্রিয়লাল বিব্রত বোধ করে। ঝগড়া করলে স্বর্ণকে খুব খারাপ দেখায়। গলা মোটেই মিষ্টি শোনায় না। প্রিয়লাল চায় কেবল কথা বলতে। ঝগড়া ক'রতে তো চায় না, অথচ স্বর্ণ তা বোঝে না, কিংবা বুঝেও না বোঝার ভাণ করে।

স্বর্ণ মাছ কোটা শেষ করে চৌবাচ্চা থেকে বালতি ভরে জল তুলে মাছ ধোয়। তারপর বারণ্ডার তোলা উনান থেকে কড়া নামিয়ে কাঁধা উঁচু পিতলের পাত্রটায় ডাল সম্ভার দিয়ে রেখে মাছ চড়িয়ে দেয়। প্রিয়লাল বসেই থাকে।

মাছের ঝোলটা যখন প্রায় ঘন হয়ে ওঠে তখন এসে ঘরে ঢোকে স্বর্ণ। মাটির কলস থেকে জল গড়িয়ে দেয় গেলাসে।

তারপর ঢোকে গিয়ে তক্তপোষের তলায়। রাঁধাবাড়া হয় বারাণ্ডাতেই, কিন্তু সেখানে কিছু রাখবার জো নেই। জল হলে বৃষ্টির ছাট আসে, খরার দিনে রোদের তাপে ভাত তরকারী শুকিয়ে ওঠে। রেঁধে বেড়ে সব একে একে তাই এই তক্তপোষের তলাতেই রাখে স্বর্ণ। বিধবা নিভাননী প্রথমে খুব খুঁৎ খুঁৎ করতেন, এখন আর কিছু বলেন না।

ভাতে হাত দিয়ে প্রিয়লাল বলে, 'মাছের ঝোল না খাইয়ে বুঝি আর ছাড়বে না? ভেজে দিলেই হোত একখানা। এদিকে যে লেট হয়ে গেলাম।'

স্বর্ণ বলে, 'লেট না ঘোড়ার ডিম হলেন। আর অত ভয়ই বা কিসের? একদিন লেট হ'লে কি ফাঁসি হবে, না চাকরি যাবে?'

প্রিয়লাল ফিস ফিস ক'রে বলে, 'অমন যদি বরাভয় দাও তাহ'লে রোজ লেট হই। ফাঁসি গেলেও ভ্রূক্ষেপ করি না, চাকরি গেলেও না।'

স্বর্ণের মুখখানা প্রথমটা লাল হয়ে ওঠে, তারপর আবার পাংশু ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বলে, 'ছিঃ অমন বাজে রসিকতা ক'রতে আসবেন না আমার সঙ্গে। ও সব ভালোবাসি না আমি।'

স্বর্ণ গম্ভীর মুখে ডালের বাটী এগিয়ে দেয়, মাছের ঝোল ঢেলে দেয় পাতে। তারপর হাঁড়ি থেকে হাতায় ক'রে ফের ভাত দিতে গিয়ে হঠাৎ তক্তপোষে মাথা ঠুকে যায়। মড়া কাঠের আচমকা গুতো। লেগেছেও বেশি। বেদনায় বিরক্তিতে মুখখানা কালো হয়ে উঠছিল। প্রিয়লাল হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে বলল, 'গেছে গেছে তো আমার তক্তপোষখানা?'

সুবর্ণ আর হাসি চাপতে পারল না। খিল খিল করে উঠল হেসে। আর একবার হাসি যদি আরম্ভ হয় সহজে তা থামতে চায় না। হাসতে হাসতে সুবর্ণ লুটোপুটি খাচ্ছে, ভারি চমৎকার লাগে দেখতে।

সুবর্ণ হাসতে হাসতে বলে, 'বাপরে বাপ, মানুষকে এমনও হাসাতে পারেন আপনি। ভাঙা তক্তপোষের জন্য মায়াই আপনার বেশি হোল, 'আমার যে মাথা ফেটে গেল তাতে কোন দুঃখ নেই!"

এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রিয়লাল ফিস ফিস ক'রে বলে, 'দুঃখ আবার নেই! ঠোক্কর লেগেছে তোমার মাথায়, কিন্তু হৃদয় আমার ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। একথা কি বলবার জো আছে। বললেই তো তুমি এসে মুখ চেপে ধরবে।'

সুবর্ণ এসে মুখ চেপে ধরল না, মুখ কালো করে ধমক দিয়ে উঠল, 'ছি, ছি, ফের আবার আপনি এসব আরম্ভ ক'রেছেন প্রিয়লাল দা? দাদার বন্ধু না আপনি, আপনার না বাড়িতে বউ আছে ছেলেমেয়ে আছে তিনটি? মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন বলে কি আমার সঙ্গে এই সব নোংরা রসিকতা করবার অধিকারও আপনার জন্মে গেছে?'

সুবর্ণ ছোট নয়। এই তেইশ বছর বয়সে সংসারে তেয়াত্তর বছরের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। মানুষকে চিনতে তার আর বাকি নেই। 'আ, তু' বললে তারা ঘাড়ের ওপর চড়ে বসে। ফেরার সময় ঘাড়ে ক'রে তারা নিয়ে যায় না, উল্টো কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যায়।

প্রিয়লাল গম্ভীর মুখে খেতে লাগল।

নিভাননী এসে বসলেন কাছে 'ওমা, ব'সে ব'সে তুই কি দেখছিস সুবি, প্রিয়র পাতে ভাত নেই যে!'

প্রিয়লাল বলল, 'ভাত আর লাগবে না মাসীমা এই মাত্র নিয়েছি।'

নিভাননী বললেন, 'কথা শোন ছেলের। এই নিলেই যেন আর নেওয়া যায় না। ভাতে কম পড়বে ভেবেছ না কি? কি দিনই গেছে ওবার। হিসাব ক'রে গুনে গুনে মানুষ ভাতের দানা মুখে দিত। পাছে এ বেলা এক মুঠো বেশি খেলে ও বেলা উপোষ থাকতে হয়। দে সুবি ভাত দে প্রিয়কে। আর মাছের তরকারী দে আর একটু। ওর কথা শুনিসনে তুই।'

সুবর্ণ ভাত দিতে যাচ্ছিল প্রিয়লাল প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, 'ঠাট্টা পেয়েছ না কি? সব কিন্তু শেষে প'ড়ে থাকবে পাতে।'

ধমকের বহরে নিভাননীও যেন বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন, তারপর সামলে নিয়ে হেসে বললেন, 'ভারী তো ভয় দেখাচ্ছ বাবা, পাতে কিছু থাকলে তা বুঝি নষ্ট হবে, খাওয়ার লোক বুঝি আর কেউ নেই এখানে?'

প্রিয়লাল চেয়ে দেখল মুখখানা সুবর্ণের লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভাত আর সুবর্ণ দিল না। প্রিয়লাল মনে মনে ভাবল, কেন ভাত দিল না সুবর্ণ। মায়ের সামনে ধমক দেওয়ায় সে কি অপমানিত বোধ ক'রছে, না পাছে সত্যিই প্রিয়লাল পাতে ভাত রেখে যায় সেই ভয়ে? পাতে ভাত রেখে গেলে কি খাবে না সুবর্ণ? কেন খাবে না লজ্জায় না ঘৃণায়?

খাওয়া হয়ে গেলে আঁচিয়ে এল প্রিয়লাল। পানের খিলিটা অন্যান্য দিনের মত আজ আর হাতে দিল না সুবর্ণ, একটা বাটীতে করে রেখে দিল তক্তপোষের ওপর।

প্রিয়লাল পান না নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুবর্ণ বলল, 'পান নিলেন না আপনি?'

প্রিয়লাল বলল, 'না ওটা তক্তপোষেই থাক।' আমাকে ছুঁলেই জাত যায় আমার তক্তপোষে তো আর যায় না।'

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল স্বর্ণ, 'ছি ছি ছি, কি ছোটলোক আপনি। এতখানি নোংরা মন নিয়ে যাতায়াত করেন আপনি। যান, এখনই নিয়ে যান আপনার তক্তপোষ। আর এক মুহূর্তও যেন আমার ঘরে ওটা না থাকে। নিয়ে যান বের করে।'

নিভাননী নিজের রান্নার জোগাড় করছিলেন। চেঁচামেচি শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, 'কি, হয়েছে কি তোর স্বৰি। অমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন? ডাকাত পড়েছে নাকি বাড়িতে?'

কিন্তু তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে সব থেমে গেছে। আর কারো মুখে কোন কথা নেই। গম্ভীর মুখে সন্দিগ্ধ চোখে দরজার দিকে তিনি একবার তাকালেন। তারপর বললেন, 'মুখশুদ্ধি টুদ্ধি কিছু পেয়েছ প্রিয়লাল?'

'হ্যাঁ।' বলেই প্রিয়লাল পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, মুখ তারও থমথম করছে।

তক্তপোষখানা প্রিয়লালেরই। যুদ্ধের আগে আড়াই টাকায় কিনেছিল। এখন ওটার দাম চৌদ্দ টাকা। যতবার বাসা কিংবা মেস বদলেছে ততবারই এখানা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে। কুলি আর রিক্সা ভাড়ায় দামের চতুর্গুণ খরচ হয়েছে। তবু বিক্রী করেনি কিন্তু এবার নিমতলা অঞ্চলের যে কাঠগোলার দোতালায় সীট নিয়েছে প্রিয়লাল, সেখানে এই তক্তপোষ ধরল না। এক ঘরে থাকতে হয় সাতজনকে, তার ওপর আবার তক্তপোষ। পেতে তো শোয়ার জোই নেই, খাড়া ক'রে যে কোথাও রাখবে এমনও জায়গা নেই

একটু বিক্রি করবার জন্য খদ্দের ডাকছে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুবর্ণদের কথা। কিছুকাল ধরে ওদের ওখানে প্রিয়লাল খোরাকী খরচ দিয়ে খাচ্ছিল। পাইস হোটেলের চেয়ে ব্যবস্থাটা অনেক ভালো। খরচ প্রায় সমান সমান পড়লেও ডালের মধ্যে কেন তো আর ওরা মিশিয়ে দেবে না, টাটকা ব'লে বাসি তরকারীও দিতে পারবে না এনে পাতে, আর শত হলেও মেয়েছেলের রান্না। হাতের গুণে স্বাদটাও তাতে থাকবে।

মায়ে ঝিয়ে শুয়ে থাকত একতলার এই স্যাঁৎসেতে মেঝেয়।

প্রিয়লাল বলল, 'আমার একখানা তক্তপোষ আছে এনে দি।'

নিভাননী বলল, 'সে কি বাবা, তুমি কি পেতে শোবে?'

প্রিয়লাল বলল, 'সেজন্য ভাববেন না, আমার চেয়ে আপনাদের দরকার বেশি।'

আড়ালে পেয়ে সুবর্ণকে জবাব দিল, 'এতে আমার দরকারও মিটবে।'

সুবর্ণ বলল, 'কি অসভ্য আপনি।'

প্রত্যেকটি পায়ার নিচে দুখানা ক'রে ইট দিয়ে দিয়ে বেশ উঁচু ক'রে প্রিয়লালই তক্তপোষখানা পেতে দিয়ে গেল। বলল, 'দেখ, তোমাদের একতলা ঘরকে কি রকম দোতলা বানিয়ে ছাড়লুম।'

তা এক রকম দোতলাই হোল। রেঁধে বেড়ে ভাত তরকারী এনে সুবর্ণ তক্তপোষের তলায় রাখতে লাগল। সেখান থেকে প্রিয়-লালদের পরিবেশন করে।

প্রথম দিন তক্তপোষের ওপর সুবর্ণের মা নিভাননীই শুয়েছিল। সুবর্ণ ঘুমিয়েছিল মেঝেতে বিছানা পেতে, কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে

নিভাননী গজ গজ করতে লাগল। ছারপোকার কামড়ে সারারাত ঘুম আসেনি নিভাননীর। সে আর ওর ওপর শোবে না। দূর ক'রে দাও এই তক্তপোষ। যার খাট নিয়ে যাক সে। দরকার নেই এমন ভালো মানুষেমির। তারপর থেকে স্বর্ণ নিজেই উঠল খাটে। রাত্রির প্রথম দিকটায় ছারপোকায় একটু কামড়ায় বটে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে প্রায় কোন অসুবিধা হয় না স্বর্ণের, লক্ষ ছারপোকার কামড়েও তার ঘুম ভাঙে না।

এ সব ইতিহাস স্বর্ণের মুখ থেকেই প্রিয়লাল শুনেছে। শুনতে শুনতে এমন অদ্ভুত প্রশ্নও একেকবার মনে এসেছে এই যে, ছাড়পোকার কামড়ে স্বর্ণের কোন কষ্ট হয় না, সে কি কেবল তার ঘুম বেশি থাকার জন্যই? সালঙ্কারে স্বর্ণের এই গাঢ় ঘুমের বর্ণনার মধ্যে কি আর কোন অর্থ নেই, আর কোন ব্যঞ্জনা?

প্রিয়লাল বেরিয়ে গেলে স্বর্ণ বলল, 'মিথ্যা কথা কেন বলতে গেলে মা। কারো পাতের ভাত আমি খাই? দেখেছ আমাকে খেতে কোনদিন? গা ছুঁয়ে বল দেখি?'

নিভাননী গম্ভীর মুখে বললেন, 'বললাম বলেই হোল না কি?'

'হোল না? ভদ্রতা ক'রে আজ হয়তো পাতে কিছু রেখে গেল না কিন্তু কাল থেকে দেখবে রোজই হয়তো ভাত তরকারী রেখে যাবে।'

নিভাননী কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তাতে তোর কি হবে পোড়ারমুখী। ওর নিজের খোরাক নিজে নষ্ট করবে, নিজেই মরবে খিদেয় জ্বলে।'

স্বর্ণ অদ্ভুত একটু হাসল, 'তেমন ভালো মানুষই ওকে ভেবে

রেখেছ বুঝি ? নিজের ভাত তরকারী নষ্ট করবে তেমন মানুষই পেয়েছ ওকে ? পেট ভরে নিজে আগে খাবে, তারপর অন্যের খাবার চেয়ে চেয়ে নিয়ে এঁটো ক'রে রেখে যাবে পাতে। তোমার আর কি, তুমি তো ব'লেই খালাস, তোমার তো আর গিলতে হবে না তা ?'

নিভাননী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন তারপর কঠিনকণ্ঠে বললেন, 'আমি কেন গিলতে যাব, গিলবি তুই। গিলতে পারলেই যখন ধন্য হয়ে যাস তখন গিলবি।'

স্বর্ণ চেঁচিয়ে উঠল, 'মা হয়ে তুমি এই কথা বললে আমাকে ? বেশ, পারব না আমি, পারব না আর কাউকে রেঁধে খাওয়াতে। ব'লে দিয়ো বিকাল থেকে কেউ যেন এখানে আর না আসে। [illegible] থাকব সেও ভালো।' [illegible] যেন কেউ

নিভাননী বললেন, 'তা থাকতে পারলে [illegible] ননী পান

স্বর্ণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আমি [illegible] এই আট নিয়ো। কিন্তু তুমি কোনদিন পারবে [illegible] যেই কথা জানো ব'লেই এমন করছ, তো[illegible] ঘটবে না বলছ জেগে থাকতে।'

নিভাননী তেড়ে এলেন, 'মেয়ে হয়ে তুই [illegible] না। ছেলে[illegible] গলায় দড়ি দিয়ে মরলেও তো এ জ্বালা আ[illegible] মা বাপ

স্বর্ণ জবাব দিল, 'আর মা হয়ে তুমি যে [illegible], তারী গলায় দড়ি দিলেই আমার জ্বালা মিটবে ?'

রাত্রে প্রিয়লাল খেতে এসে দেখল তক্তপোষের উত্তর দিকে যে [illegible] চিত জায়গা আছে সেখানে মাদুর পেতে স্বর্ণ পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে।

তক্তপোষের তলা থেকে নিভাননী লাগলেন পরিবেশন করতে।

প্রিয়লাল গম্ভীর মুখে বলল, 'আপনি কেন মাসীমা। ওর কি হোল, ও কি এরই মধ্যে আজ ঘুমিয়ে পড়ল না কি ?'

নিভাননী বললেন, 'হয়তো ঘুমিয়েই প'ড়েছে বাবা। শরীরটা আজ ওর ভারী খারাপ।'

প্রিয়লাল অদ্ভুত একটু হেসে ডালের বাটীটা পাতের কাছে টেনে নিতে নিতে বলল, 'শরীর বুঝি ওর দুপুরের পর থেকে খারাপ মাসীমা ? রান্নাবাড়া আপনাকেই সব করতে হয়েছে না ?'

নিভাননী অবাক হয়ে বলল, 'কেন বাবা, রান্না তো এখনো তুমি খেয়ে দেখনি।'

প্রিয়লাল তেমনি হাসল, 'খেয়ে দেখতে হবে কেন মাসীমা। রঙ ...তে পারছি। কিন্তু বুড়ো মানুষ আপনি, এত কষ্ট করবার ... কি। এক বেলা না হয় হোটেলেই খেতাম।'

... বলল, 'তাই কি আর হয় বাবা। যতক্ষণ পর্যন্ত হাড় ক' ...তক্ষণ কি আর তোমাদের হোটেলে খেতে বলতে পারি। ...টেলের চেয়ে রান্না বোধহয় নিতান্ত খারাপ হয়নি।'

...রে চলতে হয় প্রিয়লালকে। প্রিয়লাল অনেক জানে। ...রও ক'রেছে। কিন্তু তার কৃতজ্ঞতার দাবীর যেন শেষ ...নিকে পূজা ক'রতে হয় তার দৃষ্টি ছাড়াবার জন্য। কিন্তু ...ভেই দৃষ্টি যে তার ছাড়তে চায় না।

হঠাৎ নিভাননী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালো কথা প্রিয়লাল, সুবর্ণের ...ন্য তোমাকে যে একটা সম্বন্ধ দেখতে ব'লেছিলাম, তার কি করলে ? তুমি একটু গা করলেই হয়ে যায় বাবা। পুরুষ মানুষ দশ জায়গায় যাওয়া আসা কর, দশজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে তোমার

একটু চেষ্টা করে দেখ না বাবা। দোজবর-টোজবর হলেনও আপত্তি নেই। মেয়েরও তো বয়স কম হোল না। আর ভালো চাইলেই তো কপালে ভালো মিলবে না।'

প্রিয়লাল তেমনি গম্ভীর মুখে বলল, 'আচ্ছা দেখব মাসীমা।'

ভারী দায় পড়েছে প্রিয়লালের। মাসে মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা খরচ ক'রে এখানে খাবে। আবার দেশ ভ'রে তার মেয়ের জন্য সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াবে। এই ধাড়ী বজ্জাত মেয়েকে কেউ ঘরে নেওয়ার জন্য ব'সে আছে। সাত খোপ কবুতর খেয়ে বেড়াল আজ তপস্বী হয়েছে। একটু ছুঁলেই তার জাত যায়, একটু হাসলেই গায়ে ফোস্কা পড়ে। এদিকে পেট তো চলে প্রিয়লালের খরচে।

পরদিন থেকে মাও গম্ভীর, মেয়েও গম্ভীর। দুজনের মুখ যেন কেউ সেলাই ক'রে রেখেছে। স্বর্ণ নীরবে পরিবেশন করে, নিভাননী পান এগিয়ে দেন। আচ্ছা, প্রিয়লালও দেখে নেবে। মাসের এই আট দশটাদিন গেলেই সে গিয়ে আবার ঢুকবে হোটেলে। আর যেই আসুক এত খরচও কেউ দেবে না। এত ফাই ফরমাসও খাটবে না কেউ।

দিন কয়েক পরে প্রিয়লাল হঠাৎ এক সম্বন্ধ নিয়ে এলো। ছেলের নাম গোকুল রায়। প্রিয়লালদের অফিসেই কাজ করে। মা বাপ কেউ নেই। তবে ছেলে খুব ভালো। বয়স সাতাশ আটাশ, ভারী চৌকস ছেলে।

নিভাননী সন্দিগ্ধভাবে বললেন, 'কিন্তু এমন ছেলে আমার মেয়েকে কেন নেবে বাবা? তাছাড়া আমি তো কিছু দিতে থুতেও পারব না। শাঁখা সিঁদুরেই নামাতে হবে মেয়েকে।'

প্রিয়লাল বলল, 'তাই করবেন। ছেলের দাবীটাবী কিছু নেই। মেয়ে দেখে পছন্দ হ'লেই হোল।'

নিভাননী তবু বললেন, 'কিন্তু স্বভাব চরিত্র কুলবংশ ভালো ক'রে খোঁজ নিয়েছ তো বাবা?'

প্রিয়লাল বলল, 'খোঁজ না নিয়েই কি এসেছি। স্বভাব-চরিত্র নির্মল। অফিসের যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই বলবে। বংশে অবশ্য কুলীন কায়স্থ নয় আপনাদের মত। আসল উপাধি বরাট। কিন্তু ওর ঠাকুরদা নাকি রায় খেতাব পেয়েছিলেন। বাড়িঘরও ক'রেছিলেন কলকাতায়। ওর বাবা সব খুইয়েছিলেন, কিন্তু এখনো একখানা বাড়ি আছে লক্ষ্মী দত্ত লেনে। সেখানেই থাকে। বেশ ছেলে দেখুন। সেও এসে মেয়ে দেখে যাক। আলাপ-সালাপ ক'রে খোঁজখবর নিয়ে পছন্দ হয় করবেন, না হয় করবেন না।'

আলাপ-সালাপের পর গোকুলকে খুবই পছন্দ হোল নিভাননীর. অপছন্দের কিছু নেই। দিব্যি ছেলে, শান্ত বিনীত কথাবার্তা, নম্রস্বভাব। দেখতেও একেবারে কার্তিকের মত। প্রিয়লাল নেভিগেশন অফিসে পঞ্চাশ টাকা মাইনের কাজ করে এও ঠিক গোপনে নিভাননী খোঁজ নিয়ে জানলেন, পাঁচ বছর ধরে ওই অফিসে সুখ্যাতির সঙ্গেই সে কাজ করছে। প্রথমে ঢুকেছিল বাইশ টাকা এখন পায় পঞ্চাশ। এমন ছেলে, চরিত্র তার ভালই হবে। কিন্তু কু বংশ সম্বন্ধে একটু খুঁৎখুঁতি রয়ে গেল নিভাননীর। এ বিষয়ে কে কোন পরিষ্কার খোঁজখবর দিতে পারে না। কিন্তু কায়েত যে একথা সবাই বলে। তাই হলেই হোল। তারপর আর সব মেয়ের ভাগ্য এমন সুবিধায় এমন সুপাত্র আর কোথায় পাবেন নিভাননী।

পথে নিয়ে প্রিয়লাল গোকুলকে সাবধান করে দিল, খবরদার সাতপুরুষের নামধাম সব ঠিক করে রাখিস কিন্তু, সকলের উপাধি যেন বরাট হয়, আর গোত্র কাশ্যপ। বার টানটা প্রথম প্রথম ছেড়েই দিস। মুখ রাখিস আমার।

গোকুল হেসে প্রিয়লালের পিঠ চাপড়ে দিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু এতে তোর কি স্বার্থরে প্রিয় ? এমন চমৎকার মেয়ে হাতছাড়া করছিস কেন ? কিছু ঘটিয়ে-টটিয়ে বসিসনি তো ? ভাই past আমার নয়, সে সম্বন্ধে কোন prejudice নেই, কিন্তু দেখিস সেটা যেন futureএ গিয়ে না গড়ায়। তা হলে কিন্তু ফের তোমার ঘাড়ে এনে ফেলে দেব। বিয়ের আগে অবশ্য Medical Examine আমি করিয়ে নিচ্ছি।

প্রিয়লাল বলল, 'ছি ছি ছি, আমাকে অবিশ্বাস করছিস তুই ? তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি সে সব কিছু নয়।'

গোকুল বলল, 'আচ্ছা দেখাই যাবে।'

মুখে যতখানি যা-তা গোকুল বলেছিল কার্যত অবশ্য তার কিছুই করল না। দিব্যি শান্ত ছেলের মত বিয়ে করে বউকে নিয়ে ঘরে তুলল। নীচের দুখানা ঘরে ভাড়াটেরা থাকে। ওপরের দুখানা নিজের। একখানা প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকত, বিশেষ উৎসব আয়োজনে বিশেষ বিশেষ অতিথিরা আসত এখানে। আজ সেখানা ড্রয়িংরুমে দাঁড়াল। বাকিখানা যৌথ বেডরুম।

মাকে নিয়ে আসবার ইচ্ছা স্বর্ণ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু গোকুল রাজী হয়নি। বলেছে তাতে তাঁর সম্মানের হানি হবে। তার চেয়ে ওখানেই তিনি থাকুন। মাসে মাসে মাসোহারা পাঠাবে তাঁকে

গোকুল। মনে মনে ভাবল এই ব্যবস্থাই ভালো। কে জানে কোন সময় যে একটু বেশি বেসামাল হয়ে পড়বে তার তো কিছু ঠিক নেই। আর একটা দিক থেকে গোকুল ভারি সতর্ক হয়ে গেল। প্রিয়লালকে মোটেই প্রশ্রয় দিল না। প্রায় সমস্ত সংস্রব তার এড়িয়ে চলতে লাগল। স্বামীর মনের ভাব টের পেয়ে স্বর্ণও এ সম্বন্ধে আর কোন কথা তুলল না।

মাঝে মাঝে নিভাননী দেখা করতে আসেন। খোঁজখবর নিয়ে যান মেয়েজামাইয়ের। প্রিয়লাল নাকি একবার বাসা করেছিল, আবার বাসা তুলে দিয়ে হোটেল ধরেছে।

বছর দেড়েক পরে গোকুল স্বর্ণকে মায়ের কাছে যেতে অনুমতি দিল। ঘরে মেয়েছেলে আর কেউ নেই। আর প্রথম প্রথম এ অবস্থায় মেয়েদের মার কাছে থাকাই নাকি ভালো। বেশ যত্নে থাকবে, প্রিয়লালকেও এখন আর কোন ভয় নেই গোকুলের। সাত-আট মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা, স্বর্ণের যে রূপ এখন খুলেছে তা কেবল গোকুলেরই চোখে পড়বে, প্রিয়লালদের চোখ হয়তো টাটাবে, মুগ্ধ কিছুতেই হবে না।

স্বর্ণ ফের ফিরে এসেছে সেই মণ্ডল ষ্ট্রীটের বাড়িতে। স্যাঁৎসেঁতে একতলার একখানা ঘর, ছাতলা-পড়া ছটাকখানেক উঠান আর চৌবাচ্চা। ইচ্ছা হলে আজই স্বর্ণ চলে যেতে পারে। গোকুল যাওয়ার সময় সে কথা বলেও গেছে—'খারাপ লাগলে থেকো না।' কিন্তু খারাপ স্বর্ণের লাগছে না। অনেক দুঃখের স্মৃতি অবশ্য জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। কিন্তু তা তো আর সত্যি সত্যিই দুঃখ নয়, দুঃখের স্মৃতি মাত্র।

সুবর্ণ ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। প্রিয়লালের তক্তপোষটি এখনো এখানেই আছে। তার ওপর নিভাননীর বিছানা। প্রাণ্ড ছারপোকার কামড়ে নিভাননীর বুঝি আজকাল আর ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করল, 'তক্তপোষটি প্রিয়লালদা নিয়ে যান নি?'

নিভাননী বলল, 'নেবে কোন চুলোয়? কাঠগোলায় কি আর জায়গা আছে না কি?'

কিন্তু কাঠগোলা আর এই ঘর ছাড়া বুঝি আর জায়গা নাই পৃথিবীতে।

সুবর্ণ বলল, 'প্রিয়লালদার থালা গ্লাসও রয়ে গেছে দেখছি।'

'নিয়ে গিয়েছিল, আবার এনে দিয়েছে। মাসখানেক ধরে আবার এখানেই খাচ্ছে কিনা। হোটেলে খেতেও পারে না, টাকাও লাগে বেশি।'

সুবর্ণ মনে মনে হাসল। আসলে এখানকার মায়া প্রিয়লাল কাটাতে চায় না। 'দু'বেলা তোমাকেই রাঁধতে হয় তো?'

'তা আর কি করব মা। শত হলেও উপকারটা তার দ্বারাই হয়েছে তো!'

সুবর্ণ ফিক করে একটু হাসল, 'উপকার না ঘোড়ার ডিম। দাও মা আমিই আজ রাঁধি।'

'না বাছা রেঁধে তোমার আর দরকার নেই। এমনিতে সুস্থ থাকো সেই আমার ভালো।'

সুবর্ণ লজ্জিত মুখে বলল, 'আহাহা, রেঁধে যেন আমি আর খাইনে।'

নিভাননীর বাধা মানল না সুবর্ণ। জোর করে গিয়ে রাঁধতে বসল। কোন ক্লেদ নেই মনে, এত ভার সত্ত্বেও শরীর যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে। একবার ঘরে যাচ্ছে, একবার বাইরে। বাড়িওয়ালার ঠিকে ঝিকে ডেকে টাকা বের করে দিল সুবর্ণ। 'সামনের দোকান থেকে ঘি আর গরমমসলা নিয়ে আয়।'

প্রিয়লাল এল যথাসময়ে। অবাক হয়ে বলল, 'তুমি ?'

সুবর্ণ বলল, 'কেন আমার আর আসতে নেই বুঝি ? একেবারে পর হয়ে গেছি না ?'

প্রিয়লালের চোখে পড়ল সরু এক গাছি হার ঝুলছে সুবর্ণের গলায়। কানে আটা দুখানা ইয়ারিং, হাতে চুরিও পরেছে চার গাছ করে। চাকরি ছেড়ে কনট্রাক্টরী কাজের মধ্যে গিয়ে এই যুদ্ধের বাজারে ভালোই করেছে গোকুল। দুহাতে পয়সা কামাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু অবশ্য চোখে পড়ল প্রিয়লালের। বুকের মধ্যে একটু কেমন যেন করে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্তে মুখে হাসি টেনে বলল, 'পর ছাড়া আর কি, খোঁজখবর তো নাও না, দাও-ও না।'

'ঈস আপনিই যেন খোঁজখবর কত নেন-দেন। একবার না হয় যেচেই যেতেন। দেখতাম কত টান।'

নিভাননী বলল, 'আমি একটু আসি ও-বাড়ি থেকে প্রিয়লাল। ভুবন ঠাকুর চমৎকার ভাগবত পড়ছেন। একটু শুনে আসি গিয়ে।'

নিভাননী সরে গেলে সুবর্ণ বলল, 'গেলেন না কেন শুনি ? সাহস পেলেন না, না ?'

প্রিয়লাল অবাক হয়ে গেছে। এ সুবর্ণ অন্য এক সুবর্ণ। এর কথার জবাব দেওয়া সহজ নয়।

ঠাঁই করে ঠিক আগের মতই প্রিয়লালের সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিল স্বর্ণ। যত্নটা আগের চেয়ে অনেক বেশী, কায়দাটা অনেক পাকা।

প্রিয়লাল বলল, 'এত সব রাঁধল কে, তুমি ?'

স্বর্ণ বলল, 'কেন আজকাল বুঝি আর রঙ দেখে রান্না চিনতে পারেন না। খেয়ে দেখুন পারেন কিনা। পারবেন ব'লে তো মনে হয় না।'

প্রিয়লাল হেসে বলল, 'কেন ?'

স্বর্ণ বলল, 'জিভ কি আছে মুখের মধ্যে ?'

জিভ অবশ্য মুখের মধ্যেই আছে প্রিয়লালের। কিন্তু তা যেন একেবারে আটকে রয়েছে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে স্বর্ণ পান দিল এনে হাতে। প্রিয়লাল আজ আর আঙুল চেপে ধরল না। অতি সন্তর্পণে পানটা হাত থেকে নিল। স্বর্ণের আঙুলিগুলির ডগাই যেন হাতের তালু একবার স্পর্শ করল প্রিয়লালের। দু-একটা কুশল প্রশ্নের পর প্রিয়লাল চলে যাওয়ার আয়োজন করছে, স্বর্ণ বলল, 'বারে এখনই যাচ্ছেন যে। এত তাড়াতাড়ি কিসের, রাত্রেও অফিস আছে নাকি আপনার ?'

প্রিয়লাল ভাবল একবার জিজ্ঞাসা করে রাত্রের অফিস গোকুলের এখনো আছে না কি ? কিন্তু বলতে বাধল। স্বর্ণের কথার মধ্যে কুশ্রী কোন অর্থ যদি সত্যিই না থাকে ? অনর্থক কেন ধরা দিতে যাবে প্রিয়লাল।

'না, রাত্রে আবার অফিস কিসের।'

'তা হ'লে বসুন না, একটু পরেই না হয় যাবেন। বসুননা।' সুবর্ণ প্রিয়লালের তক্তাপোষ দেখিয়ে দিল।

প্রিয়লাল লক্ষ্য করল চমৎকার দামী একখানা সুজনী তার জীর্ণ তক্তাপোষখানায় সযত্নে বিছিয়ে দিয়েছে সুবর্ণ। সুজনীর দামের মধ্যে খানিকটা দেমাক যে নাই তা নয়, এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়।

প্রিয়লাল বলল, 'সুজনীটা কিন্তু বেশ হয়েছে। বেশ চমৎকার রঙ।'

সুবর্ণ বলল, 'হবেনা? এ আমার নিজের পছন্দ করে কেনা, আপনার বন্ধুর যা একখানা পছন্দ।'

প্রিয়লাল বলল, 'অন্তত একখানা পছন্দ তার তো ভালই হয়েছে।'

সুবর্ণ প্রিয়লালের চোখের দিকে চেয়ে হাসল, 'তাই নাকি? হলেই ভালো, আমি তো ভেবেছিলাম এতদিনে আপনার মত বদলেছে।'

কথায় কথায় কখন প্রিয়লালের পাশে প্রায় গা ঘেঁষে বসে পড়েছে সুবর্ণ। মেয়েটা ভেবেছে কি? নিভাননী এসে পড়লে কি মনে করবেন।

'এতদিন পরে এলুম, কই একবার তো জিজ্ঞেসও করলেন না, কেমন আছি, বেঁচে আছি না মরে গেছি।'

'তুমিও তো জিজ্ঞেস করোনি।'

'আমি আবার জিজ্ঞেস করব কি, দশাটা তো আপনার দেখতেই পাচ্ছি চোখের সামনে।' বলে সুবর্ণ আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

নিভাননী এসে ঘরে ঢুকলেন, 'আঃ, অত হাসছিস কেন সুবি, এ অবস্থায় অত হাসা কি ভালো?'

ঝিকে যাকে দেখেও সুবর্ণ আজ আর হাসি থামালো না। আপন ঐশ্বর্যে, আপনি উচ্ছলতায় চারদিক সে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

ভালো, আর কি ভালো নয়, তা ঠিক করবার ভার আজ তার নিজের হাতে।

প্রথম বসন্ত

ম্যাট্রিক পরীক্ষা হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুইশান শেষ হোল, কিন্তু তশিলদারী আর শেষ হতে চায় না। লতার বাবার কাছে বিনয় এখনো পনেরটি টাকা পাবে। মাসিক কুড়ি টাকা দক্ষিণায় তিন মাসের টুইশান। প্রথম মাসের টাকাটা ভদ্রভাবেই আদায় হয়েছিল। দ্বিতীয় মাসের দক্ষিণা প্রমথবাবু তিন কিস্তিতে শোধ করেছেন। কিন্তু এই তৃতীয় মাসের টাকা বুঝি মারাই গেল। পাঁচ টাকা দিয়ে সেই যে প্রমথবাবু অন্তরালে আশ্রয় নিয়েছেন আর সামনে আসেন নি।

পনেরটি মাত্র টাকা। তার জন্যে সপ্তাহে দুবার ক'রে এভাবে তাগিদ দিতে যাওয়ায় নিজের দীনতাও কম নেই। ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নেওয়ার যুক্তিতেও সেই দৈন্য যেন ঢাকা পড়তে চায় না। সারাদিন অফিসের খাটুনির পর আবার এই অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হ'তে মনও ভারি ক্লান্তি বোধ করে। কিন্তু করলে হবে কি, এই পনের টাকার দাম এখন পনের শো। সপ্তাহ তিনেক যাবত বাড়িতে ভাইপোটির টাইফয়েড। এক রাজসূয় ব্যাপার। ক্লান্ত শরীরে রাতের পর রাত জাগতে হয়, ছুটোছুটি করতে হয়

ডাক্তারখানায় ; বিরক্তি চেপে বউদিকে আশ্বাস দিতে হয়; [illegible] এবং সম্মান বাঁচিয়ে দাদাকে তার সর্বজনীন নির্লিপ্তির জন্যে ভর্ৎসনা না করলে চলেনা।

কিন্তু এতেও দায়িত্বের শেষ নেই। ধার-করা টাকা ফুরিয়ে এলেই বউদি কল্যাণী একদিন বাদে বাদে জিজ্ঞাসা করে, 'ভালো কথা ঠাকুরপো, ছাত্রীর বাবার কাছ থেকে আদায় হোল টাকাটা ?'

বিনয়ের দাদা প্রকাশও তার স্বাভাবিক নির্লিপ্ততা বজায় রেখেই বলে, 'কেন মিছামিছি কষ্ট করছিস, ও কি আদায় হবে ? ওর আশা ছেড়ে দেওয়া ভালো।' কি আদায় হবে না এবং কিসের আশা ছেড়ে দেওয়া ভালো সে কথা অপ্রকাশিত থাকলেও বিনয়ের বুঝতে বাকি থাকে না। ভিতরে ভিতরে মন তার জ্বলতে থাকে, বিন্তুর অসুখ উপলক্ষে অমন কত পনের টাকা বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে বিনয় ধার ক'রে আনছে, সে হিসাব প্রকাশ রাখে না ; কিন্তু একজন ধড়ীবাজ লোকের কাছ থেকে নিতান্ত প্রয়োজনের সময়ও বিনয় যে তার প্রাপ্য পনেরটি টাকা আদায় ক'রে আনতে পারছে না, প্রকাশের কাছে বিনয় যেন সেজন্যে চির অনুকম্পনীয় হ'য়ে রয়েছে।

বিরক্ত অপ্রসন্ন মুখে অফিস ফেরৎ বিনয় চিৎপুরের ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজার ভিড় ঠেলে বি কে পাল এভেনিয়ুর মোড়ে নেমে পড়ল ! প্রমথবাবু আজ আবার তারিখ ফেলেছেন। নির্ঘাৎ আজ নাকি টাকাটা দিয়েই দেবেন।

মোড়ে নেমে খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হয়। বেনেটোলা ষ্ট্রীটের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে বাড়ি। পুরোন, ঐতিহাসিক আমলের কলকাতা। যেমন জীর্ণ তেমনি অপরিচ্ছন্ন।

নাগরিক কায়দায় বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়ে লাভ নেই, বাড়িটির সাতখানা ঘরে ছ'ঘর ভাড়াটে, কড়া নাড়লে সহজে কেউ জবাব দেয় না। প্রত্যেকেই ভাবে অন্য ঘরের অতিথি, সে কেন সাড়া দেবে। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে পরিচিত নাম ধ'রে ডাকতে হয়। কিংবা গলা খাঁকারি দিয়ে অভিনয় করতে হয় নকল কাসির। উঠানে খোলা চৌবাচ্চার কাছে কোনো ঘরের বউঝি যদি বে-সামাল ভাবে থাকে সাবধান হ'য়ে যাবে। কাসিটা বিনয়ের ভালো আসে না। তার চেয়ে নাম ধ'রে ডাকতেই সে ভালোবাসে। 'প্রমথবাবু আছেন ?'

দু'তিনবার ডাকবার পর দোতলার ঘর থেকে একটি সতের আঠার বছরের মেয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল, 'কে ? ও, মাস্টারমশাই ? বাবাকে চাইছেন ? তিনি তো এখনো ফেরেন নি।'

'ফেরেন নি !'

লতা বলল, 'না কিন্তু ফেরার সময় হয়েছে। আসুন, বসুন না এসে।'

আমন্ত্রণে আশান্বিত হয়ে বিনয় উপরে উঠে এলো। না ফিরলেও টাকাটা হয়তো প্রমথবাবু রেখেই গেছেন।

বিনয় এসে ঘরে ঢুকে ছোট টেবিলটির ধারে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসল।

লতা বলল, 'দাঁড়ান, এই আসনটা আগে পেতে দিয়ে নি।'

এই মাস-তিনেক বিনয় যখন পড়াতে আসত আসনটা চেয়ারের ওপর পাতাই দেখত। আগেই সেটা পেতে রাখত লতা। খালি চেয়ারে মাস্টার মশাই বসতে পারবেন না। যা ছারপোকা। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হ'য়ে যাওয়ার পর আসনটা ওভাবে পেতে রাখবার

প্রয়োজন আর নেই। সেটা এখন দুটো ঘর ভ'রে নড়ে চ'ড়ে বেড়ায়। কখনো মা সেখানে পেতে সন্ধ্যা করতে বসেন, কখনো বাবা টেনে নিয়ে যান তার উপর ব'সে ড্রইং করবেন।

বিনয় গম্ভীর মুখে বলল, 'আসন থাক, আসনে দরকার নেই।'

লতা বলল, 'না, দরকার নেই! খালি চেয়ারে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারবেন কেন।'

বিনয় বলল, 'আসন থাকলেও বেশিক্ষণ ব'সে থাকতে পারব না। তোমার বাবা কিছু ব'লে গেছেন?'

লতা বলল, 'বলছি, একটু বসুন।'

লতা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল।

বিনয় মনে মনে এবার আশ্বস্ত হোল, তাহ'লে প্রমথবাবু কি সত্যই টাকাটা রেখে গেছেন? রাখতেও পারেন। শত হ'লেও চক্ষুলজ্জা ব'লে একটা জিনিষ তো আছে মানুষের, এই নিয়ে আজ চারদিন ওই সামান্য টাকার জন্যে বিনয় তাগিদ দিতে এলো।

খানিকবাদে লতা এলো ফিরে। একহাতে সেই চটের আসন আর এক হাতে গোল সাদা একটি চায়ের পেয়ালা। কাপটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে লতা বলল, 'উঠুন, আসনটা আগে পেতে দি। বাব্বাঃ, এই চেয়ারে কি মানুষ বসতে পারে!'

বিনয় লক্ষ্য করল আগের চেয়ে ভারি সপ্রতিভ হয়েছে লতা। পরীক্ষার চিন্তায় এতদিন যেন সে নুয়ে পড়েছিল, তিনবার জিজ্ঞাসা ক'রেও একটি কথার জবাব পাওয়া যায় নি। কিন্তু এখন আর তার কথার অভাব হয় না। পরীক্ষা হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত জড়তা গেছে কেটে। ফিরে এসেছে সহজ সুন্দর নিশ্চিন্ত কতকগুলি

দিন। অঙ্কের পেপারটা অবশ্য লতা ভালো দেয়নি। কিন্তু টেনেটুনে যে ভাবেই হোক পাশ করবে। দু'চার নম্বর শর্ট পড়লে গ্রেস কি আর একেবারে মিলবে না? তা ছাড়া মাষ্টারমশাইও তো খোঁজখবর নেবেন ব'লে ভরসা দিয়েছেন। সে যা হয় হবে। রেজাল্ট বেরুবার দু'তিন সপ্তাহ আগে সে কথা চিন্তা করবে লতা। এখন তো এই দু'মাস নিশ্চিন্ত মুক্তির স্বাদ গ্রহণ ক'রে নিক।

অন্যান্য দিনের মতো আজও লতা একটু প্রসাধন করেছে। চুল আঁচড়ে সযত্নে বেঁধেছে খোঁপা। মুখের শ্যামবর্ণে চিক্‌চিক্ করছে সামান্য পাউডারের ছোপ। কপালের ছোট টিপটি মন্দ দেখাচ্ছে না। মুখখানির গড়ন নিখুঁৎ না হ'লেও লতার দুটি ঠোঁট আর চিবুকের ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর।

অবশ্য এ সৌন্দর্য বিনয়ের প্রথম কিছুদিন চোখে পড়েনি। প্রথম প্রথম বরঞ্চ ওর মুখ বিনয়কে বিমুখই করেছে। মনে হয়েছে মুখখানা যেন একটু বেশি ছোট, গড়নটা একটু বেশি রকমের গোলাকার। কালো রঙের ওপর পাউডারের ছোপ লাগিয়ে আসায় এবং কৃত্রিম উপায়ে ঠোঁটকে রঙীন করবার চেষ্টায় বিনয় মুগ্ধ হয়নি, ওর রুচির কথা ভেবে মনে মনে হেসেছে। মুখ নয়, বরং ওর শীর্ণ ঘাড়ের ওপর নুয়ে-পড়া রাশীকৃত চুলের আলগা খোঁপাটা দেখতে বিনয়ের ভালো লেগেছে। তখন মুখ তুলে বেশি তাকায়ওনি লতা। বইয়ের ওপর মাথা নিচু ক'রে পড়া মুখস্থ করেছে, বিনয়ের দেওয়া টাস্‌ক্ করেছে ব'সে ব'সে, বিনয় মনে মনে প্রার্থনা করেছে ও যেন মুখ তুলে বেশি না চায়। ওর ওই কালো গোল ভোঁতা মুখের চেয়ে স্তূপীকৃত চুলের রাশ অনেক সুন্দর, অনেক রহস্যময়।

কিন্তু এই সাড়ে তিন মাস ধ'রে দেখতে দেখতে লতার মুখ যখন মোটামুটি সহনীয় হ'য়ে আসছে তখন ধীরে ধীরে মত বদলেছে বিনয়ের, চোখ বদলেছে। মুখেরও কি কিছু পরিবর্তন হয়নি লতার? কবরীর রহস্যের চেয়ে মুখের রহস্য আরও বিস্ময়কর, সে মুখ যত শ্রীহীনই হোক না কেন। সযত্ন-রচিত কবরী প্রতি সন্ধ্যায় বদলায়, কিন্তু মুখের মতো এমন প্রতি মুহূর্তে বদলাতে পারে না, আনতে পারে না নিত্য নতুন আভাস, নতুনতর সম্ভাবনা। কবরী দেখে দেখে চোখ হয়তো ভরে, কিন্তু মুখ না দেখলে মন ভরে না।

বিনয়ের দিকে তাকিয়ে সলজ্জে একবার চোখ নামাল লতা, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'চা কি খুব খারাপ হয়েছে মাস্টারমশাই?'

বিনয় চমকে উঠে বলল, 'কেন খারাপ হবে কেন।'

'খারাপ হয়নি, তাহ'লে খাচ্ছেন না যে, রাগ করেছেন, বুঝি?'

পড়াশুনোর ব্যাপারে লতা কোনদিন সাহস ক'রে কোন মন্তব্য করেনি, কিন্তু এখন পড়াশুনোর বাইরে এসে দিনের পর দিন তার ক্রমবর্ধিত সাহস দেখে বিনয় অবাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাহসটি নিতান্তই যে খারাপ লাগছে তা নয়।

বিনয় বলল, 'রাগ তো হওয়ারই কথা।'

লতা বলল, 'কেন?'

বিনয় বলল, 'এত খাটলুম তোমার অঙ্কের পেছনে, তবু সেই অঙ্কটাই খারাপ করলে।'

লতা ঠোঁটের অপূর্ব ভঙ্গি ক'রে বলল, 'ও, আমি ভাবলুম অন্য কোনো কারণে বুঝি রাগ হয়েছে আপনার। আমার বুকের ভিতরটা এখনো কাঁপছে।'

বিনয় মনে মনে হাসল। মেয়েটা বোধ হয় একটু বেশিই পেকেছে। এতদিন কেবল অঙ্কের ভয়েই লতার বুক কেঁপেছে, এখন তার কম্পনটা অঙ্ককে অতিক্রম ক'রে যেতে চায়।

বিনয় এবার চট ক'রে আসল কথায় এসে পড়ল, বলল, 'ভালো কথা। তোমার বাবা কিছু বলে গেছেন আমার সম্বন্ধে?'

লতা অসঙ্কোচে বলল, 'না তো।'

বিনয়ের আর ধৈর্য রইল না, নিষ্ঠুরভাবে বলল, 'না তো! আমার মাইনেটা সম্বন্ধে আজও কি কিছু ব'লে যান নি? এই সামান্য পনেরটা টাকা নিয়ে কতদিন ঘোরাতে চান তিনি?'

লতা কিছুক্ষণ নত মুখে চুপ ক'রে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বলেছেন বসনালয়ের বিলটা আজও পান নি। তারা সামনের সোমবার তারিখ দিয়েছে। টাকাটা হাতে এলেই বাবা নিজে গিয়ে আপনার ঠিকানায় দিয়ে আসবেন। ঠিকানা তো আছে আমাদের কাছে।'

বিনয় শ্লেষ ক'রে বলল, 'তা তো আছেই। কিন্তু তিনি দিয়ে আসবেন এই ভরসায় থাকলে টাকাটা কোনো দিনই বোধ হয় আমার কাছে গিয়ে পৌছবে না।'

লতার চোখ দুটো অপমানে যেন ছল ছল ক'রে উঠল। আত্ম-সম্বরণ ক'রে বলল, 'তেমন ভাববেন না আমাদের। টাকা নিশ্চয়ই আপনি পাবেন।'

বিনয় বলল, 'পেলেই ভালো, আমি আর আসব না! টাকাটা যেন তিনি পাঠিয়ে দেন। এই নিয়ে চার দিন হোল, ওই সামান্য টাকার জন্যে এমন ক'রে তাগিদ দিতে আসতে আমারও লজ্জা করে। বাড়িতে নিতান্ত অসুখ-বিসুখ চলছে এই জন্যেই—'

লতা বলল, 'ভালো কথা, আপনার ভাইপোর অসুখ কেমন, মাস্টারমশাই ?'

বিনয় গম্ভীর মুখে, বলল, 'একই রকম।'

বিনয় উঠে পড়ল। ফেরার পথে তাকে আবার ডিস্‌পেনসারি হ'য়ে যেতে হবে।

ঘর থেকে বেরোতেই দোরের কাছ থেকে লতার ছোট ছোট চার পাঁচটি ভাই বোন তাড়াতাড়ি স'রে গেল। বিনয় যে কড়া মাস্টার তা তারা বুঝেছে। আর এই কয়েক দিন ধ'রে সে যে আরও কড়া হচ্ছে একথাও টের পেতে ওদের বাকি নেই।

প্রথম প্রথম যখন আসত বিনয়, তখন ওদের মধ্যেও বেশ একটা সাড়া প'ড়ে যেত। শব্দ হোত ফিস ফিস ক'রে, 'মাস্টার এসেছে, দিদি মাস্টার এসেছে।'

লতা ফিস ফিস ক'রেই সেদিন ধমক দিয়েছিল, 'মাস্টার কিরে! বলবি মাস্টারমশাই।'

লতার বোন সতী বলেছিল, 'বা-রে, মাও তো মাস্টারই বলেন।

লতা ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'হ্যাঁ, বলেন না আরো কিছু। তা ছাড়া মা বলেন ব'লে তুইও বলবি না কি ?'

পেছনে পেছনে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এল লতা, বলল, 'মঙ্গলবার দিন আসবেন কিন্তু।'

বিনয় ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসবার তো কথা ছিল না।'

খানিকক্ষণ আগের কথাবার্তার কথা মনে ক'রে লতা সলজ্জে মুখ নামাল, তারপর বলল, 'কথা না থাকলেই আসতে নেই বুঝি ?'

বিনয় বলল 'আচ্ছা দেখা যাক।'

লতা ফিরে এসে রান্নাঘরে ঢুকে মাকে বলল, 'মা, বাবাকে ব'লো বাকি টাকাটা যেন দিয়ে দেন মাস্টারমশাইকে। ছি ছি, আমার ভারি লজ্জা করে।'

নির্মলা গম্ভীর মুখে বলল, 'কেন তুই বলতে পারিসনে?'

লতা বলল, 'বাবাকে এসব কথা বলতে আমার ভারি লজ্জা করে।'

নির্মলা এবার রাগ ক'রে উঠল, 'তোর তো সবতাতেই লজ্জা। আমি তখনই বলেছিলাম দরকার নেই মাস্টার রেখে। ভাত জোটেনা আবার নবাবী আছে সাড়ে ষোল আনা। কুড়ি টাকা দিয়ে মেয়ের মাস্টার না রাখলে আর চলল না। প'ড়ে আর পাশ ক'রে তো মেয়ে ভারি কৃতার্থ করবেন। এই ষাটটা টাকা থাকলে কত এগুতো সংসারের। ছেলেমেয়েগুলোর জামা নেই, ফ্রক নেই, সেসব দিকে কোন খেয়াল আছে কারো? কেবল টাকা দাও বইয়ের জন্যে, পড়ার জন্যে, আর টাকা দাও মাস্টারকে। অর্ধেক সারা গুষ্টী আর অর্ধেক মা ষষ্টি।'

লতাও চ'টে উঠে বলল, 'কে রাখতে বলেছিল তোমাদের মাস্টার? তখন মনে ছিল না? এখন মাইনে চাইতে এলেই মুখ কালো হয়ে যায় আর সারা গুষ্টীর কথা মনে আসে, না?'

নির্মলা ধমক দিয়ে বলল, 'দেখ্ আমার সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করতে আসিস নে। চার আঙুলে মেয়ে আট আঙুলে কথা। মাস্টার যে রেখেছিল তাকে বলবি। বিক্রি ক'রে হোক, বন্ধক রেখে হোক সে এনে টাকা দেবে তোর মাস্টারের। আমি কি জানি?'

রাত্রির খাওয়া দাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে বাপের হাতে পান দিতে দিতে লতা বলল, 'মাস্টারমশাই আজও এসেছিলেন বাবা।'

প্রমথ পান চিবুতে চিবুতে বলল, 'এসেছিল নাকি?'

'বাঃ আসবেন না, আপনিই তো আসতে ব'লে গিয়েছিলেন? ভদ্রলোককে কথা দিয়ে কেন এমন ক'রে ঘোরাচ্ছেন। ফেলে দিলেই তো হয় পনেরটা টাকা।'

প্রমথ চ'টে উঠে বলল, 'ফেলে দিলেই হয়! টাকার গাছ আছে কিনা বাড়িতে! তোর আর কি, মুখ থেকে কথা খসালেই হয়ে গেল। ফেলে দিলেই হয়!'

লতা কিছুক্ষণ মুখ ভার ক'রে রইল, তারপর বলল, 'তাহলে ব'লে দিন মাস্টারমশাইকে, টাকা আপনি এখন দিতে পারবেন না।'

প্রমথ বলল, 'ও কথা কি কেউ আর স্পষ্ট ক'রে বলে? ও কথা কেউ বলে না। তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে যেত, এমন ঘোরাঘুরির দায় থেকে বাঁচতাম।'

প্রমথর শেষ কথাটির অসহায় করুণ সুর লতার কানে লাগল। তার যেন সব মনে প'ড়ে গেল, 'তাহলে বসনালয় থেকে টাকাটা আজও আদায় হয়নি?'

প্রমথ ম্লান হাসল, 'না রে পাগলী না। তা হলে কি আর মাস্টারের ঐ কটা টাকা আমি ফেলে রাখি? এলে বলিস বুঝিয়ে, বিল আদায় হলেই তার টাকা আমি দিয়ে দেব। তার পনের টাকা মেরে আর আমি লাখপতি হব না।'

লতা বলল, 'কিন্তু তাঁর বাড়িতে অসুখ বিসুখ কিনা—'

প্রমথ বলল, 'সে সব বাড়িতেই আছে। টাকার তাগাদায় এলে অসুখ অমন সকলের বাড়িতেই হয়। অসুখ! যেন আমরা ভারি সুখে আছি।'

মঙ্গলবার দিন অফিস ফেরৎ বিনয় আবার এসে হাজির।

'প্রমথবাবু আছেন ?'

কিন্তু প্রমথ আজ সত্যিই আছে। মেয়েকে বলল, 'দেখ তো কে।'

'মাস্টারমশাই।'

'মাস্টারমশাই ? তাকে আজ আবার কে আসতে বলল ? তুই বুঝি ? না, তোদের জ্বালায় আমি বাড়ি-ঘরে আসা বন্ধ করব ? ব'লে দে বাবা নেই বাড়িতে।'

লতা বলল, 'বলতে হয় আপনি গিয়ে বলুন। আমি পারব না।'

প্রমথ স্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে বলল, 'শুনলে ? কথা শুনলে মেয়ের ?'

নির্মলা বলল, 'তুমিই শোন। কেন, ঘটি বাটি বিক্রি ক'রে না খেয়ে না দেয়ে লেখা-পড়া শেখাও মেয়েকে !'

অবশ্য তেমন জাঁদরেল নাছোড়বান্দা কোনো পাওনাদার নয়, মুখচোরা মাস্টার। ওর মুখোমুখি হতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবু সব সময়ই কি অমন তাগিদ আর ওয়াদা ভাল লাগে মানুষের ?

প্রমথ গম্ভীর মুখে মেয়েকে বলল, 'না পারলে চলবে কেন ? যেমন ডেকেছিস তেমনি নিজেই কথাবার্তা বলে বিদায় ক'রে দিয়ে আয়। বকবক করবার সময় নেই আমার, কাজ আছে।'

প্রমথ তার ছবি আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তাড়াতাড়ি স্টুডিওতে গিয়ে ঢুকল। ছাদের ওপর ছোট্ট একটু চিলেকোঠার মতো আছে। বাড়িওয়ালাকে অনেক ব'লে ক'য়ে মাসিক চার টাকা ভাড়ায় প্রমথ সেটাকে তার স্টুডিও ক'রে নিয়েছে। গোটা-

চারেক টাকা বেশি ব্যয় বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে প্রতিদান যা এই ঘরটুকুর কাছ থেকে পাওয়া যায় তার তুলনা হয় না। এই ঘরটুকু না থাকলে নির্মলা আর তার একপাল ছেলেমেয়ের অনুক্ষণ চেঁচামেচির মধ্যে সাধ্য ছিল কি প্রমথর যে একমিনিটও তুলি নিয়ে বসতে পারত? কিন্তু ইদানীং শুধু প্রাণ নয়, মানও বাঁচায় এই চিলেকোঠা। বিনা নোটিশে অবাঞ্ছিত অভ্যাগত কেউ এলে প্রমথ এর মধ্যে এসে আশ্রয় নেয়, ব'লে পাঠায় স্টুডিওতে আছে। দু'চার জন নিতান্ত অভদ্র পাওনাদার ছাড়া পিছু পিছু এতখানি এসে আর্টিস্টের ধ্যানভঙ্গ করতে কেউ সাহস পায় না।

বিনয় লতাদের ঘরে ঢুকে দেখল আজ শুধু চেয়ারের ওপরই যে ফুল-তোলা চটের আসনটা পাতা আছে তা নয়, টেবিলেও নতুন একখানি টেবিল-ঢাকনি এসেছে। লতার নিজের হাতের তৈরী— সবুজ সরু একটি লতা চারপাশ দিয়ে ঘুরে এসেছে, মাঝে মাঝে বেরিয়েছে দু' একটি পাতার অঙ্কুর।

বিনয় ভূমিকা ক'রে বলল, 'বাঃ, তোমার হাতের কাজ তো বেশ ভালো।'

লতা প্রথম যেন ভারি লজ্জিত হোল, তারপর বলল, 'আমার হাতেরই যে কাজ তা আপনাকে কে বলল?'

বিনয় হাসল, 'ও কি আর বলতে হয়! কাজ দেখেই চেনা যায়।'

লতা আরক্ত মুখে বলল, 'যান।'

তারপর হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিনয় মনে মনে ভাবল ওদের লজ্জাটুকু ভারি উপভোগ্য। এই সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সে ঠাট্টা পরিহাসের ভিতর দিয়ে অবশ্য আরো অনেক মেয়ের এমন উপভোগ্য লজ্জা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য বিনয়ের হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সব মনে পড়ল না। মনে হোল এই প্রথম, একটি তরুণী মেয়ের লজ্জানত দুটি চোখ এই যেন প্রথম তার চোখে পড়ল।

খানিক বাদে লতা আজও সেই বড় দুগ্ধধবল কাপটিতে চা আনল, চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নিজের হাতে তুলে দিল বিনয়কে। বড় মধুর বড় নয়নাভিরাম লতার এই সতর্ক সঙ্কোচ।

চায়ে চুমুক দিয়ে বিনয় বলল, 'তারপর, পড়াশুনোর বালাই তো গেছে। সারাটা দিন কি ক'রে কাটাও? ঘুমো বুঝি খুব?'

'হুঁ, তাই বুঝি ভাবেন। ঘুমোবার সময় তো খুব। কাজ আছে না সংসারে? এতোদিন একটু আলগা ছিলাম কিনা। এখন সুদে আসলে সব শোধ দিতে হচ্ছে।'

বিনয় বলল, 'সে রকম শোধ তো সবারই দিতে হয়। তবুও ইচ্ছে থাকলে সময়ের অভাব হয় না।'

লতা আরও অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠল, 'ঘুমোবার সময় তবুও হয়। কিন্তু ঘুমোবার ইচ্ছে আমার হয় না। আমার ইচ্ছে করে কি জানেন? বেশ একটু ঘুরেটুরে বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসি। অনেক দূরে চ'লে যাই।'

বিনয় হাসল, 'সেটা অবশ্য একটু শক্ত। দূরের কথা থাক। সুবিধা মতো কাছাকাছিও যদি একটু বেড়াতে পার দেখবে খুব চমৎকার লাগবে। ধরো কোনদিন বা গেলে বালি, কোনদিন বা

টালিগঞ্জ। মাত্র সামান্য একটু চোখ বদলানো, কিন্তু মনে হবে পৃথিবীটাই যেন আগাগোড়া বদলে গেছে।'

লতা উল্লসিত হ'য়ে উঠল, 'সত্যি, তাহলে যাবেন একদিন নিয়ে?' সঙ্গে সঙ্গে মুখটা আরক্ত হ'য়ে উঠল লতার, সামলে নিয়ে বলল, 'মানে শিবু বিভূতি সতী ওরাও থাকবে সঙ্গে।'

বিনয় স্বর নামিয়ে হঠাৎ বলে ফেলল, 'থাকতেই যে হবে তার কি মানে আছে?'

এক অপূর্ব সম্ভাবনায় লতার সমস্ত শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সভয়ে চারিদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'ছি ছি ছি, কি অসভ্য আপনি। কেউ যদি শুনে ফেলত।' তারপর কানে কানে বলবার মত ক'রে বলল, 'জানেন তো বাবা কি কড়া।'

বিনয় কেমন যেন একটু হাসল, বলল, 'তাই না কি? তা তো জানতাম না। তিনি কোথায়? আজও ফেরেননি না কি?

লতা তেমনি আস্তে আস্তে বলল, 'ফিরেছেন, ফিরেই ছবি আঁকতে বসেছেন। এদিকে আসবেন না। কি একটা জরুরী অর্ডার আছে কি না।'

ভাইপোর কতকগুলি জরুরী ওষুধপথ্যের কথা বিনয়ের মনে পড়ল, বলল, 'দরকারটা আমারও তো জরুরীই ছিল, তিনি ভুলে গেছেন বুঝি।'

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেল লতা। মুখ নীচু ক'রে এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। যেন সামলে নেওয়ার জন্যে সময় চাই তার।

বিনয় কঠিন শ্লেষের ভঙ্গিতে বলল, 'ওটা বুঝি তিনি আজও দিতে

পারবেন না? বিলটা আজও আদায় হয় নি, না? এ আমি জানতুম। ঘরে ঢুকেই আমি টের পেয়েছি।'

একটু অপ্রত্যাশিত আঘাতে লতা যেন চমকে উঠল, মনে হোল সে বুঝি আর্তনাদ ক'রে উঠবে। কিন্তু তা করল না, সোজা বিনয়ের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘরে ঢুকেই কি টের পেয়েছেন আপনি বলুন, কিসে কি টের পেয়েছেন?'

বিনয় অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু লতার উদ্ধত ভঙ্গি তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাল—'কিসে টের পেয়েছি তা তোমারও টের পাওয়ার কথা। অত বোকাও তুমি নও, খুকিও তুমি নও।'

কথা বলতে গিয়ে লতার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। রক্তের চাপে মুখখানা যেন ফেটে পড়বে।

শেষ পর্যন্ত লতা বলল, 'না, তা কেন হব। কিন্তু আপনার মতো অত ইতরও নই, অভদ্রও নই। দাঁড়ান, নিয়ে যান আপনার টাকা। যে ভাবেই হোক টাকা আমি এখনই আদায় ক'রে দিচ্ছি আপনাকে।'

নৃশংসতার একটা তীব্র স্বাদ আছে, নোংরামির মধ্যে আছে উগ্র মাদকতা। বিনয় উন্মত্তের মতো বলল, 'থাক্। ও টাকা তোমাকে আমি দিয়ে গেলুম।'

লতা বলল, 'দিয়ে গেলেন? কেন? আপনার টাকা আমি কেন নিতে যাব?'

বিনয় বলল, 'মনে করো টাকাটা তোমারই, এতক্ষণ ধ'রে যা দিয়েছ তা পনের টাকার চেয়ে বেশি।'

লতা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হ'য়ে রইল। কালো পাথরের মতো থম থম করতে লাগল মুখ, তারপর সেও এক ঝিলিক হাসল, 'কিন্তু মাষ্টারমশাই, আরও বেশি যদি দিতাম, আর দয়া ক'রে আরও বেশি যদি নিতেন তা'হলে অন্তত পনের শো টাকাও তো খরচ করতে হোত বাবাকে। এই পনের টাকা না হয় তাই মনে ক'রেই নিন। দাঁড়ান, পালাবেন না, টাকাটা আজ নিয়েই যান।'

বিনয় শুধু স্তব্ধ নয়, এতক্ষণ খানিকটা যেন মুগ্ধের মতোও তাকিয়ে ছিল। তীরের ফলাগুলি তার বুকেই এসে বিঁধছে, তবু তাদের কারুকার্যটা দেখবার মতো।

লতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে সে-ই আগে বেরিয়ে এল। তারপর সিঁড়ির মুখে পা দিয়ে হঠাৎ একবার মুখ ফিরিয়ে বিনয় বলল, "আজ থাক, আর একদিন এসে পনেরশোই না হয় নেব।'

চাঁদ মিঞা

ট্রামের মধ্যে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। নানা কসরতের পর দুই বন্ধুতে কোন রকমে ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়েছিলাম। আর আমাদের খুব কাছেই আর একজন তরুণ ভদ্রলোক তাঁর সহযাত্রিণীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন এবং সিগারেট [illegible]ছিলেন। সমস্ত লেডিজ সীটগুলি ভরতি। অন্যান্য যাত্রীরা মেয়েটিকে আসন ছেড়ে দিয়ে বার কয়েক শিষ্টাচার দেখিয়েছেন কিন্তু তরুণীটি সহাস্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিছুতেই বসতে রাজী হন নি। ঠিক তেমনি

তাঁর সহযাত্রীটির ধূমপানে ও আকারে ইঙ্গিতে অনেকেই আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোককে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় নি। তিনি বেশ সতর্কতার সঙ্গেই কখনো বা গাড়ীর মধ্যে কখনো বা বাইরে সিগারেটের ছাই ফেলছিলেন। হঠাৎ মেয়েটির কি একটা কথায় তিনি স্থানকাল ভুলে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সিগারেটের ছাই আমার র‍্যাপারের ওপর দিলেন ছিটিয়ে।

রুক্ষ কণ্ঠে প্রায় চেঁচাবার মত ক'রে বললুম, 'এটা কি হোল ?'

দুজনেই চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। যুবকটি অপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন, 'Sorry'।

বন্ধু মসিয়র রুখে উঠে কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মেয়েটি তাকে কিছু বলবারই সুযোগ দিলেন না, তাড়াতাড়ি রুমাল বার ক'রে সিগারেটের ছাইগুলি আমার র‍্যাপার থেকে ঝেড়ে দিতে দিতে অত্যন্ত লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'কিছু মনে ক'রবেন না।'

এরপর কিছু আর মনে ক'রবার জো ছিল না। কিন্তু যুবকটি দেখলাম ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে আমার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে ক'রবেন না, আপনি বরং তার চেয়ে প্রতিশোধ নিন।'

মেয়েটির মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল, 'আঃ থাম, কি হ'চ্ছে।'

ট্রাম থেকে নেমে মসিয়র বলল, 'তুমি একেবারেই ভ্যাবা গঙ্গারাম। লোকটিকে আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিতে পারলে না যে মশাই আমার সিগারেটের ছাই গায়ে মেখে আপনার কি কিছু লাভ হবে ? আমার কিছু লাভ হবে ? আমার সঙ্গে কাঠখোট্টা এক বন্ধুই রয়েছে, অমন কোমল হৃদয় সুন্দরী কোনো বান্ধবী তো নেই ?'

হেসে বললুম, 'তা নাই বা থাকল। তাঁর সঙ্গে যিনি ছিলেন ছাই ঝাড়বার পক্ষে তিনি একাই কি যথেষ্ট ছিলেন না?'

মসিয়র গম্ভীর হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'সে কথা ঠিক। পুরুষের ঈর্ষা বড় বিচিত্র বস্তু।'

তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি আজ বড় বাঁচা বেঁচে গেছ। মেয়েদের সহানুভূতিও কম সাংঘাতিক নয়।'

খানিকটা হাঁটতেই একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। সেখানেও ভিড়। তবু তারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটু নিরিবিলি কোণ বেছে নিয়ে দুজনে বসলুম। একটা কাটলেটের খণ্ড কাঁটায় ফুঁড়ে মুখে তুলতে তুলতে মসিয়র বলল, 'আজকের এই ছোট ঘটনায় আমার অনেককাল আগের একটি কাহিনীর কথা মনে পড়ছে।'

বললুম, 'ব্যক্তিগত না কি?'

মসিয়র বলল, 'না ঠিক ব্যক্তিগত নয়, তবে প্রায় পরিবারগত বলতে পার। কাহিনীর নায়ক নশরৎ আলী ছিলেন আমার বাবারই আপন চাচা। সেই হিসাবে তাঁর ঘরের গুপ্ত কথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সমীচীন নয়। কিন্তু কথাটা কিছুতেই গোপন ছিল না। স্বয়ং নশরৎ আলী আর তাঁর উত্তরপুরুষদের চেষ্টাতেও নয়। বেশ মনে আছে, আমাদের অঞ্চলে ছেলেবেলায় এ নিয়ে ছড়া গান পর্যন্ত লোককে বাঁধতে শুনেছি।

মীরপুর এবং আশেপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের জমিদার ছিলেন নশরৎ আলী মৃধা। লোক লস্কর, পাইক পেয়াদা, কিছুরই অভাব ছিলো না। অভাব ছিল কেবল সন্তানের। পীরের দরগায় সিন্নি

দিয়ে, ফকির দরবেশের কাছ থেকে নানা রকম গাছ-গাছড়া তাবিজ কবচ জড়ো ক'রেও ছেলে তো ভালো, একটি কাণা মেয়ের মুখ পর্যন্ত মৃধা সাহেব দেখতে পারেন নি। কিন্তু অদ্ভুত তাঁর জেদ। বলতেন খোদার সঙ্গে আমার জেহাদ। ছেলে যতদিন না হবে ততদিন কেবল বিবির পর বিবি এনে ঘর ভ'রে ফেলব, দেখি ছেলে না হয়ে যায় কোথায়। আমি জানি, আমার নিজের কোন দোষ নেই, ছেলে যে হয় না তা কেবল এই বিবিদের দোষ।

প্রায় ষাটের কাছাকাছি যখন তাঁর বয়স তখন কেবল গুটিচারেক বিবি তাঁর ঘরে ছিলেন এবং আর গুটি চার পাঁচ ম'রে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন।

তার কিছুকাল আগে থেকেই শুধু ফকির দরবেশের কেরামতিতেই নয়, খোদার অস্তিত্বের ওপরও মৃধা সাহেব আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। মোল্লা মুন্সীদের দেখতে পারতেন না, বাড়ি থেকে কোরাণ সরিফ দূর ক'রে ফেলেছিলেন, রোজা নামাজ পর্যন্ত পালন ক'রতেন না।

মানুষজনের চেয়ে পশু পক্ষীর ওপরই প্রীতি যেন তাঁর কিছু বেশি পরিমাণে ছিল। বিচিত্র রকমের বিচিত্র রঙের পাখী পুষতেন, আর ছিল ঘোড়া। হরিহরছত্রের মেলায় নিজে যেতেন ঘোড়া কিনতে। বেছে বেছে নানা আকারের নানা রঙের ঘোড়া আনতেন। ঘোড়ার রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে রাখতে সহিসদের, ঘোড়ার নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে রাখতেন তাদের নাম।

নশরৎ আলীর মস্ত বড় বাড়ীর পাশেই ছিল মস্ত বড় মাঠ। তার অর্ধেকটা জুড়ে পৌষ মাস থেকে ঘোড়দৌড় সুরু হ'ত। শ'য়ে শ'য়ে ঘোড়া আসত। আর হাজারে হাজারে লোক। প্রত্যেক

ঘোড়াওয়ালাকে নশরৎ আলী কলস দিয়ে সম্মানী দেখাতেন আর তার সওয়ারদের দিতেন দামী শাল।

একদিন নশরৎ আলীর কানে গেল তিন চারখানা গাঁ পশ্চিমে নূরগঞ্জে আতাজদ্দি মিয়ার নাকি এক চমৎকার ঘোড়া আছে। তেমন ঘোড়া কাছে-ধারে আর কারো নেই। সে ঘোড়া সে ঘোড়-দৌড়ের মেলায় আনে না পাছে নশরৎ আলী তা কেড়ে নেন। শুনে নশরৎ আলী হাসলেন, তারপর ভাবলেন তিনি নিজেই যাবেন সেই ঘোড়া দেখতে আর ঘোড়াওয়ালাকে আশ্বাস আর নির্ভর দিয়ে আসতে। নিজের অদ্ভুত সব খেয়ালের কাছে মান-সম্ভ্রম পর্যন্ত তাঁর তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। আত্মীয় পরিজন কারো নিষেধ না শুনে তিনি নিজেই চললেন একদিন সেই ঘোড়ার সন্ধানে। আস্তাবল থেকে সব চেয়ে ভালো ঘোড়াটা বেছে নিয়ে চ'ড়ে বসলেন তার পিঠে। বারন সত্বেও কেউ কেউ দূরে দূরে থেকে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। পীরকান্দায় এসে একটা পানাভরা পুকুর দেখে তাঁর ঘোড়া ছুটে গেল মরিয়া হয়ে। মৃদু হেসে নশরৎ আলী রাশ ছেড়ে দিলেন।

ঘোড়ার জল খাওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল পুকুরের ওপারে একটা কুড়ের দিকে। বাড়ির বাইরের দিকে দোচালা একটা শনের ঘর, কোন দিকে কোন বেড়ার বালাই নেই। তার মধ্যে একটি মেয়ে হাঁটু গেড়ে নামাজ পড়ছিল। গাছের গোড়ায় ঘোড়া বেঁধে রেখে মুগ্ধ সাহেব নিঃশব্দে সেই ভাঙা দোচালার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন সেই নামাজ—আঠের উনিশ বছরের একটি তন্বী মেয়ের অপরূপ আত্মনিবেদন।

নামাজপড়া শেষ হ'লে পিছন ফিরে মেয়েটি তাঁকে দেখতে পেয়ে যেন চমকে উঠল, তারপর একটা অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে মেয়েটি একেবারে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পালাল।

তার ভয় দেখে মৃধা সাহেব হাসলেন, তারপর আস্তে আস্তে তিনিও এগুলেন বাড়ির ভিতরে। এ বাড়ি তাঁর অপরিচিত নয়। আইনদ্দিন ফকিরের বাড়ি। তাঁর মনে পড়ল অনেককাল আগে গাছগাছড়ার খোঁজে আইনদ্দিনের কাছে তিনি গোপনে নিজে এসেছিলেন। গাছড়া নশরৎ আলী পেয়েছিলেন কিন্তু ফল কিছু পান নি।

এতকাল বাদে নশরৎ আলীকে নিজের বাড়ীর দোরে দেখতে পেয়ে আইনদ্দিন বিস্মিতও হ'ল, ভীতও হ'ল; বলল, 'আজ্ঞে হুজুর, আপনি নিজে কেন এত কষ্ট ক'রলেন, দরকার থাকলে লোক লস্কর পাঠিয়ে আমাকে তলব ক'রলেই তো হ'ত।'

নশরৎ আলী মাথা নাড়লেন, 'না লোক লস্করে তা হ'ত না। এই মাত্র যে মেয়েটি গিয়ে ঘরে ঢুকল সে কি তোমার?'

ফকির সন্ত্রস্ত হ'য়ে বলল, 'আজ্ঞে হাঁ হুজুর।'

নশরৎ আলী বললেন, 'দেখ, বহুকাল আমার খোদার ওপর কোন আস্থা ছিল না, আজ তোমার মেয়েকে দেখে ফের আবার সেই আস্থা ফিরে এসেছে। ওর নামাজপড়া দেখে আমার ভারি সাধ হচ্ছে ওর পাশে দাঁড়িয়ে আমিও খোদার নাম ক'রে নামাজ পড়ি।'

আইনদ্দিন ফকির বিব্রত ভীত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু হুজুর, আমার মেয়ে রাবেয়া যে বড় দুর্ভাগিনী। এক সপ্তাহও হয়নি অমন জোয়ান স্বামীকে সে হারিয়েছে। দিনরাত অভাগীর চোখের জলে কাটছে।'

নশরৎ আলী বললেন, 'ভয় কি, তার চোখের জল মোছাবার ভার আমি নিলুম।'

কিন্তু তবু আইনদ্দিনের ভয় ভাঙল না। দিনে অসংখ্যবার নশরৎ আলির লোক লস্কর এসে হানা দিতে লাগল।

রাবেয়া বলল, 'বাজান, আমি মন ঠিক ক'রে ফেলেছি। তুমি মৃধা সাহেবকে বল যে আমি রাজী আছি।'

আইনদ্দীন আর তার স্ত্রী চোখের জল ফেলে বলল, 'পাগলী, আমাদের বাঁচার জন্য তুই এমন ক'রে মরণ ডেকে আনতে চাস। তার চেয়ে চল রাতারাতি এমুলুক ছেড়ে আমরা কোথাও চ'লে যাই।'

রাবেয়া তার সুন্দর ছোট কপালটুকু দেখিয়ে বলল, 'কিন্তু এ তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।'

নশরৎ আলি মিথ্যা কথা বলেন না। চোখের জল মুছবার জন্য সত্যিই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ক'রলেন। সোনাদানায় রাবেয়ার গা ভরে দিলেন, দাসী বাঁদীতে ভরলেন ঘর; কিন্তু তবু রাবেয়ার মন যেমন শূন্য ছিল তেমন শূন্যই রইল, আড়ালে চোখের জলেরও বিরাম রইল না।

অন্যান্য বিবির বেলায় এ সব রোগে নশরৎ আলি শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা ক'রেছেন। কিন্তু রাবেয়াকে দেখার পর আল্লার দুনিয়াকে তিনি যেন নতুন চোখে দেখতে সুরু করলেন।

একদিন বললেন, 'রাবেয়া, এতকাল ছেলে ছেলে ক'রে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি। ভেবেছি স্বামীর কোলে ছেলে ধ'রে দিতে না পারলে তার রূপ বৃথা, তার যৌবন বৃথা, তার মেয়ে জন্মটাই অর্থহীন। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ভুল এতদিনে ভেঙেছে। শুধু

তুমিই যথেষ্ট। তুমি যে আছ এই সব চেয়ে বড় লাভ, পুত্রলাভ এর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তোমার কাছে আলাদা ক'রে আমি কিছু চাই না, ছেলে নয় মেয়ে নয়, আমি কেবল তোমাকেই চাই।'

রাবেয়াকে নীরব দেখে বলেছেন, 'জানি চাইলেই পাওয়া যায় না, এ জিনিষ জোরজবরদস্তিতে হওয়ার নয়, এর জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়। কিন্তু অপেক্ষা করবার মত সময় আমার হাতে যে খুব বেশি নেই।'

নশরৎ আলীর কথা শুনে রাবেয়ার চোখে আবার জলের ধারা নামত। নশরৎ আলী ক্ষুণ্ণ মনে ভাবতেন দেহে এমন রূপ, কণ্ঠে এমন মাধুর্য, স্পর্শে এমন আবিষ্টতা কিন্তু চোখের জল ছাড়া কি আর কোন ভাষা রাবেয়ার জানা নেই? অমন কাজলকালো দুই চোখ কি চিরকাল কেবল জলে ভ'রে থাকবে?

হাইকোর্টে কি একটা বাটোয়ারার মামলায় হেরে নশরৎ আলী সেদিন কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ব'সেছিলেন। সেজো বিবি মেহেরজান এসে চটুল ভঙ্গিতে বলল, 'সুখবর এনেছি, কি পুরস্কার দেবে বল।'

নশরৎ আলী ভ্রূকুঁচকে তার দিকে তাকালেন। মেহেরজান একটুও ভয় পেল না, তেমনি সহাস্যে বলল, 'তোমার ছোট বিবির মন বেহেস্ত থেকে একেবারে ধূলামাটির দুনিয়ায় নেমে এসেছে। দরিয়ার সওয়ার চাঁদমিয়াকে দরিয়া একটা ছাঁট দিয়ে ফেলে দিয়েছিল—ছোট বিবি জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে আহা হা ক'রে উঠেছেন। তারপর চাঁদমিয়ার হাঁটু ছ'ড়ে আর মচকে গেছে শুনে ছোট বিবি নিজ হাতে তার জন্য চূণ-হলুদ গরম ক'রে পাঠিয়েছেন।'

নশরৎ আলী বললেন, 'কেবল এই? এও তো সেই দয়ার কথা

সেই পুরানো চোখের জলের কথা। বলি রাবেয়াকে কেউ হাসাতে পেরেছে ?'

মেহেরজান বলল, 'কেন পারবেনা ? চাঁদমিয়া তোমার রাবেয়াকে হাসিয়েছেও। দানাপানি নিয়ে ঘোড়াকে যখন চাঁদমিয়া কেবল সাধাসাধি করছিল আর তোমার সাধের দরিয়া বার বার মান ক'রে মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল আমি স্পষ্ট দেখেছি ছোট বিবিও মুখ মুচকে মুচকে হাসছে।'

নশরৎ আলি বললেন, 'হ্যাঁ এ খবরের পর পুরস্কার তুমি পেতে পার।' বলে হাতের সব চেয়ে দামী আংটি খুলে তিনি মেহেরজানকে দিতে গেলেন।

মেহেরজান পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'বাঁদীর কসুর মাপ করবেন হুজুর। ও আংটি পরবার যোগ্য আঙুল আমার হাতে নেই। তা কেবল ছোট বিবির হাতে আছে আর আছে চাঁদমিয়ার হাতে।'

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। চাঁদমিয়ার মত সুপুরুষ সহিস সওয়ারদের মধ্যে তো দূরের কথা, বড় বংশেও খুব কম মেলে। অনেক চেষ্টায় অনেক খুঁজে পেতে নশরৎ আলী তাঁর সবচেয়ে পেয়ারের দুধবরণ ঘোড়ার জন্য অমন সোণারবরণ সওয়ার সংগ্রহ ক'রেছেন। অমন সুন্দর ঘোড়ার উপর যদি কালো কুশ্রী যেমন তেমন একটা সওয়ার উঠে বসত তা হ'লে কি মান থাকত নশরৎ আলীর না, তার রুচিরই কেউ প্রশংসা ক'রত ? দৌড়ের সময় মাঠের হাজার হাজার লোক যে দিশেহারা হয়ে ভাবে, ঘোড়া দেখবে না তার ওপরের সওয়ার দেখবে এ তো নশরৎ আলীরই কৃতিত্ব, তাঁরই গর্বের বস্তু।

তবু ভালো যে তাঁর বাড়ীর একটা জিনিষ অন্তত রাবেয়ার চোখে ভালো লেগেছে। হীরা নয়, জহরৎ নয়, হরিণ নয়, ময়ূর নয়,

রাবেয়ার ভালো লেগেছে নশরৎ আলীর সবচেয়ে পেয়ারের আর সবচেয়ে খাপসুরৎ সওয়ার চাঁদমিয়াকে। এতো সুখবরই। তব মেহেরজানের কথার ধাঁচে কোথায় যেন নশরৎ আলীর একটু বিঁধল সেটা মেহেরজানের জিভেরই দোষ। এতকাল তো তাকে তিনি দেখে এসেছেন। মেহেরজানের জিভ যেমন বাঁকা, তেমনি ছুঁচালো।

এক সময় চাঁদমিয়াকে তিনি নিজের কামরায় ডাকিয়ে আনলেন 'তুমি নাকি ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়েছিল ?'

চাঁদমিয়া লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু ক'রে রইল।

নশরৎ আলী সহাস্যে সস্নেহে বললেন, 'ব্যাপার কি মিয়া, তোমা এত পেয়ারের দরিয়া, সেই তোমাকে পিঠ থেকে পায়ের নিচে ফেলে দিল ?'

চাঁদমিয়াও অপ্রতিভভাবে একটু হাসল, 'আজ্ঞে হুজুর, ওরা রং দেখবার জন্য অমন মাঝে মাঝে করে।'

'রঙ্গ দেখবার জন্য ?'

'আজ্ঞে হাঁ। ফেলে দিয়ে আমার দিকে এমন ক'রে তাকাচ্ছিল যে মনে হ'ল ওর চোখ ফেটে জল আসছে।'

নশরৎ আলী চমকে উঠে বললেন, 'কার, কার চোখ ফেটে জল আসছিল ?'

চাঁদমিয়া তেমনি বিনীত কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে হুজুর, দরিয়ার।'

'ও দরিয়ার। থাক গে, তিন দিন বাদে আবার ঘোড়দৌড়ে বন্দোবস্ত করছি। তুমি কি পারবে, না দরিয়ার রঙ্গ আর চোখে জলের লোভে পিঠ থেকে আবারও আছড়ে পড়বে ?'

'আজ্ঞে না হুজুর, তাহ'লে কি আর মান থাকে ?'

'হ্যাঁ, মানের কথা মনে থাকে যেন।'

তা মনে থাকবে চাঁদমিয়ার। রাবেয়ার দিকে তাকাতে গিয়ে ঘোড়া থেকে প'ড়ে তার লজ্জার সীমা ছিল না রাবেয়া অবশ্য করুণ-ছল-ছল চোখে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিল, নিজ হাতে দাওয়াই তৈরি ক'রে পাঠিয়েছিল কিন্তু অমন হাত থেকে কি কেবল দাওয়াই নিতে ইচ্ছা হয়, অমন চোখে কি কেবল দয়া দেখতে ভাল লাগে?

নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘোড়দৌড়ের আয়োজন পূর্ণ হ'ল। ঘোড়া আর মানুষে পূর্ণ হয়ে গেল মাঠ। নশরৎ আলীর প্রাসাদের জানালায় বিবিরা এসে দাঁড়ালেন। কুটুম্ব স্বজনরা উঠল ছাদে। সমস্ত মাঠ কল্লোলে কোলাহলে ভ'রে গেল। উৎসুক দর্শকদের ভারে আশেপাশের গাছগুলি কেবলি দোল খেতে লাগল।

পাল্লার প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে ঘোড়া ছুটল। নশরৎ আলী এক সময় এসে রাবেয়ার পাশে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'ঘোড়দৌড় তোমার ভালো লাগছে?'

রাবেয়া মাথা নাড়ল।

নশরৎ আলি বললেন, 'সাদা ঘোড়ার পিঠে চাঁদমিয়াকে বেশ মানিয়েছে, না?'

রাবেয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকাল, তার পর মৃদু একটু হেসে বলল, 'মানাবে না? মানাবার জন্যই তুমি তো এমন ক'রেছ। অমন খাপসুরৎ সওয়ারকে তুলে দিয়েছ অমন চমৎকার খাপসুরৎ ঘোড়ায়।'

এক সঙ্গে রাবেয়ার এত কথা, এত মিষ্টি কথা যেন কোন দিন নশরৎ আলী শোনেন নি। প্রসন্ন হাস্যে বললেন, 'জুড়ি মিলাবার আমার হাত আছে বলো?'

রাবেয়া আবার তার বড় বড় স্নিগ্ধ প্রশান্ত চোখ দুটি তুলে স্বামীর দিকে তাকাল, বলল, 'তা তো আছেই।'

জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ পাশের দেওয়াল-আয়নার দিকে চোখ পড়ল নশরৎ আলীর। দেখলেন, দুটি বিস্মিত বিষণ্ণ চোখ মেলে রাবেয়াও সেই আয়নার দিকেই তাকিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই রাবেয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাঠের দিকে তাকাল।

আড়চোখে নশরৎ আলী দেখলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত ঘোড়াগুলিকে পিছনে ফেলে চাঁদমিয়ার ঘোড়া বিদ্যুতের মত পাল্লার আর এক প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে নশরৎ আলী আবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন, তাকালেন অন্যদিকে মুখ ফেরানো রাবেয়ার দিকে। মনে হ'ল জোড় ঠিক মেলে নি। কিন্তু যদি না মেলে থাকে তাতেই বা কি আসে যায়? আর কেনই বা মেলেনি? মেয়েদের মত পুরুষের রূপ আর যৌবন তো কেবল তার দেহেই নয়, তার সামর্থ্যে, তার খ্যাতিতে, তার ঐশ্বর্যে, তাতো নশরৎ আলীর এখনও আছে। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর সম্পদ রাবেয়ার চোখ ঝলসে দেয়নি, রাবেয়ার চোখকে মুগ্ধ ক'রেছে তাঁরই একজন দীনাতিদীন অনুচরের দেহসৌষ্ঠব। এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে বিস্ময়ের আর কি হ'তে পারে। নশরৎ আলীর মনে পড়ল তিনিও রাবেয়ার দেহলাবণ্য দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুণ নয়, বংশ নয়, শুধু রূপ। কিন্তু নশরৎ আলী মুগ্ধ হয়েছিলেন ব'লে কি রাবেয়াও তাই হবে? অমন সুন্দর বিস্ময়কর দুটি চোখ কি কেবল পুরুষের স্থূল

দেহসৌষ্ঠবেই আটক থাকবে। আরও গূঢ়, আরও বিস্ময়কর কি আবিষ্কার ক'রতে পারবে না ?

হঠাৎ তুমুল কলধ্বনিতে নশরৎ আলীর চমক ভাঙল। 'চাঁদমি জিতেছে, চাঁদমিয়া জিতেছে।'

নশরৎ আলী অদ্ভুত একটু হাসলেন। তাঁরই ঘোড়া, তাঁরই সওয়া তবু জিত চাঁদমিয়ারই। নশরৎ আলীর নামগন্ধ কোথাও নেই।

নশরৎ আলী বললেন, 'শুনেছ, চাঁদমিয়া জিতেছে। খুশি হয়ে তো ?'

রাবেয়া বলল, 'কেন হব না, তুমি হওনি ?'

'নিশ্চয়ই।' নশরৎ আলী রাবেয়ার প্রসন্ন মুখের দিকে তাকালেন তারপর হাতের সেই দামী আংটিটি খুলে বললেন, 'এই নাও।'

রাবেয়া বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও কি, আবার আংটি কেন।'

নশরৎ আলী বললেন, 'ভারি খুশি হয়েছি। কেন না তোমাকে এতখানি খুশি হ'তে আর দেখিনি।'

রাবেয়া মৃদু হেসে বলল, 'তাই নাকি। কিন্তু বকশিষটা আমাকে কেন ?'

নশরৎ আলী বললেন, 'তবে কাকে ? চাঁদমিয়াকে ? তার জন্য ভেবনা। তাকে অন্য জিনিষ দেব। আংটিটা তুমিই পর।'

পরদিন থেকে চাঁদমিয়াকে কোথাও দেখা গেল না। দরিয়ার জন্য অন্য সহিস নিযুক্ত হ'ল। সমস্ত বাড়ীটা নিঃশব্দ ইঙ্গিতে আর আশঙ্কায় থম থম ক'রতে লাগল।

একটু ইতস্তত ক'রে রাবেয়া বলল, 'কেউ কেউ বলছে চাঁদমিয়া আর পৃথিবীতে নেই।'

নশরৎ আলী নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হাসলেন, 'কিন্তু তোমার হৃদয় কি বলছে, আর তোমার খোদা।'

রাবেয়ার ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে উঠল, কিন্তু কোন কথা বেরোল না।

একঘুমের পর জেগে উঠে নশরৎ আলী দেখলেন রাবেয়া তখনো শোয়নি। পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে নিশ্চলভাবে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। যেন শ্বেত পাথরে খোদা এক মূর্তি। রাবেয়ার এই মূর্তি, এই ভঙ্গি দেখেই নশরৎ আলি একদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর চোখ তৃপ্ত হ'ল না, জ্বলতে লাগল। জ্বলতে লাগল বুক, মনে হ'ল ও মূর্তি একান্ত পাথরেরই, ওর মধ্যে প্রাণ নেই।

তিনি ডাকলেন, 'রাবেয়া।'

দু' তিন ডাকের পর রাবেয়ার চমক ভাঙল, ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে।

নশরৎ আলী বললেন, 'খোদাকে যতক্ষণ ধ'রে ডাকছ তার চার আনি সময়ও যদি আমাকে ডাকতে আমি তোমার মনের আশা মিটাতে পারতুম। চাঁদমিয়া পৃথিবীতেই আছে। দেখবে তাকে ?'

রাবেয়া মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বলল, 'না, আমি তাকে দেখতে চাইনে।'

নশরৎ আলী বললেন, 'না চল, তোমার একবার দেখে আসা ভালো।'

হাত ধ'রে নশরৎ আলি তাকে টেনে তুললেন।

সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ। খোপে খোপে মানুষ ঘুমচ্ছে, খাঁচায় খাঁচায় পাখি। নশরৎ আলী রাবেয়াকে নিয়ে একটা অন্ধকার সংকীর্ণ

প্রকোষ্ঠে এসে থামলেন। ঘুরে ঘুরে একটা সরু সিঁড়ি মাটির নিচে গিয়ে নেমেছে। সিঁড়ির শেষে আরও ছোট, আরও সংকীর্ণ একটি ঘর। নশরৎ আলী একটা মোম জেলে রাবেয়ার হাতে দিয়ে বললেন, 'ধর', তারপর চাবি বার ক'রে বন্ধ তালা খুলে দরজার পাল্লা ঠেলে দিয়ে ব'ললেন, 'দেখ।'

মোমের ম্লান মৃদু আলো ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ল। রাবেয়া একবার সেদিকে তাকিয়েই আঁৎকে উঠে স্বামীকেই জড়িয়ে ধরল, 'না না, আমি দেখতে চাইনে।'

চাঁদমিয়ার সর্বাঙ্গ, বিশেষ ক'রে সমস্ত মুখ নির্মম চাবুকের দাগে ছিঁড়ে ফেটে গিয়েছে। ক্ষতের মুখে রক্ত কালো হয়ে জমে রয়েছে। স্ফীত মুখখানা এমন বিকৃত আর কুশ্রী দেখাচ্ছে যে মানুষের মুখ ব'লে চিন্‌বার জো নেই। চোখের ভ্রূ এবং পাতার ওপরেও চাবুকের ঘা পড়েছিল। রাবেয়ার ক্ষীণ আর্তনাদে প্রাণপণ শক্তিতে চোখের পাতা চাঁদমিয়া টেনে তুলতে চেষ্টা করল। তারপর স্বামীর সঙ্গে আশ্লিষ্ট ভীত শঙ্কিত রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হল চাঁদমিয়া যেন হাসল। রাবেয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল; তার পর কাতর মিনতিতে ব'লল, 'আমাকে নিয়ে চল!'

সঙ্গে সঙ্গে নশরৎ আলী তার ক্ষীণ কম্পিত দেহ দুহাতে তুলে নিলেন। মুখে তাঁর অদ্ভুত আত্মপ্রসাদের হাসি। শুধু চাঁদমিয়া নয়, খোদার সমস্ত দুনিয়াটাকে যদি তিনি এমনি চাবুকের ঘায়ে বিকৃত ক'রে দিতে পারতেন!

ঘরে এসে সযত্নে রাবেয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। রাবেয়া আস্তে আস্তে বলল, 'কেন এমন করলে, কি ক'রেছিল ও।'

নশরৎ আলী বললেন, 'বিশেষ কিছু করেনি। ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে জিতে এসে গভীর রাত্রে ঘুমন্ত ঘোড়াকে আস্তে আস্তে রাবেয়া রাবেয়া বলে ডাকছিল।

রাবেয়া আর কোন কথা না বলে পাশ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে নশরৎ আলী তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কথাটা শুনে রাবেয়ার মুখের রঙ কি রকম বদলায় হয়তো নশরৎ আলীর দেখবার লোভ হয়েছিল। কিন্তু তীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টির সামনে অত্যন্ত বিবর্ণ নিষ্প্রভ রক্তহীন একখানি মুখাবয়ব মৃতবৎ স্থির হয়ে রইল।

নশরৎ আলী যেন খানিকটা তৃপ্তি পেলেন। তারপর হঠাৎ পরম ঔদার্যের স্বরে বললেন, 'এই রইল সেই ঘরের চাবি। এরপর এখন তাকে নিয়ে তুমি যা খুসি তাই ক'রতে পার।

দুঃসহ আতঙ্কে রাবেয়া আর একবার শিউরে উঠল, 'না না না।'

তার সেই শিহরিত কোমল বাহুখানির ওপর আস্তে নিজের দীর্ঘ প্রশান্ত হাতখানি রাখলেন নশরৎ আলী। সমস্ত সত্তা দিয়ে রাবেয়ার সেই শিহরণ তিনি যেন অনুভব ক'রবেন, সমস্ত অনুভূতির মধ্যে সেই শিহরণটুকুকে তিনি যেন চিরকালের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখবেন।

খানিকক্ষণের মধ্যে গভীর ক্লান্তিতে নশরৎ আলী ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিন্তু রাবেয়ার চোখে ঘুম নেই। তার চোখের সামনে সেই বিকৃত ক্ষতলাঞ্ছিত মুখ অনুক্ষণ ভেসে রয়েছে। দেখে দেখে রাবেয়ার মনে হ'ল সে মুখ বীভৎস নয়, অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত অসহায়। এক অস্ফুট চাপা আর্তনাদ সেই মাটির নিচের গহ্বর থেকে রাবেয়ার কাণে যেন বারবার ভেসে আসতে লাগল।

রাবেয়া আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বসল। ঘরের এক কোণে মোমদানিতে একটা মোম জ্বলে জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। রাবেয়া আর একটা নতুন মোম জ্বালল। তক্তাপোষের নিচে তার বাবার দেওয়া বড় একটা ঝাঁপিতে অনেক গাছড়া আর নানা রকমের ওষুধের তেল ভরা রয়েছে। ফকির ব'লে দিয়েছে এগুলি তাকে সব রকম বিপদ আপদ অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা ক'রবে।

ঝাঁপিটা বার ক'রে কি একটু চিন্তা করল রাবেয়া। তারপর কয়েকখানা গাছড়া আর একটা তেলের শিশি তুলে নিল। চাবিটা তার বিছানার পাশেই প'ড়ে রয়েছে। তুলতে গিয়ে হাতটা যেন একটু কেঁপে উঠল। তারপর ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাল রাবেয়া। একটু কি ইতস্তত করল, হয়তো ভাবল তাঁকে ডেকে তাঁর অনুমতি নিয়েই যাবে। আবার কি ভেবে নিরস্ত হ'ল। তারপর চাবিটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর কোন ভয় নেই, কোন শঙ্কা নেই, অদ্ভুত সাহস এসেছে রাবেয়ার মনে। গাছড়ার ঝাঁপিতে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অলৌকিক দৈবশক্তি সে হাতে পেয়েছে। খোদার নির্দেশ শুনতে পেয়েছে হৃদয়ের মধ্যে সারারাত।

সারারাত দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে ভোরের দিকে চাঁদমিয়ার বোধ হয় একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, ঘরের মধ্যে আলো আর পায়ের সাড়ায় সে চমকে জেগে উঠল, চোখ মেলতেই দেখল রাবেয়া তার দিকে ছোট একটা শিশি হাতে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন ব্যাপারটা তার বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হ'ল না। কিন্তু পরক্ষণেই খানিকক্ষণ আগের ঘটনাটা তার মনে পড়ে যাওয়ায় সর্বাঙ্গের দুঃসহ যন্ত্রণা যেন

দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল। গূঢ় অভিমানে রাবেয়ার হাতখানা ঠেলে দিয়ে বলল, 'না'।'

ধাক্কা লেগে রাবেয়ার হাতের শিশিটা দূরে ছিটকে পড়ল। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্তে যেন বিমূঢ় হয়ে রইল রাবেয়া। তার পর হঠাৎ আঙুলের জ্বলন্ত অঙ্গুরীয়টির দিকে তার চোখ পড়ল। দুই ঠোঁটে অদ্ভুত এক ঝিলিক হাসি ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে হাতের আংটিটা খুলে চাঁদমিয়ার একটা আঙুলে পরিয়ে রাবেয়া তেমনি দুর্বোধ রহস্যময় মৃদু হাস্যে বলল, 'এবার তো আর ওষুধে তোমার কোন আপত্তি নেই ?'

বিস্ময়ে আনন্দে চাঁদমিয়া নির্বাক হয়ে রইল। দেহ মনের কোন জ্বালার কথাই তার আর মনে পড়ছে না।

রাবেয়া উঠে গিয়ে সেই শিশিটা তুলে নিয়ে এল। তারপর হাতের তালুতে ঘন খানিকটা তেল ঢেলে ডান হাতের আঙুল ভিজিয়ে চাঁদমিয়ার মুখের ক্ষতস্থানগুলিতে বুলিয়ে দিতে লাগল। চাঁদমিয়া গভীর শান্তিতে চোখ বুজিল।

হঠাৎ পিছন থেকে একখানা বজ্রকঠিন হাত এসে রাবেয়ার কণ্ঠ চেপে ধরল। রাবেয়া মুখ ফিরিয়ে দেখতে পারল না, কিন্তু হাতের স্পর্শ সে চিনতে পারল।

চাঁদমিয়া চীৎকার ক'রে এগিয়ে আসতেই পায়ের ঠোকরে নশরৎ আলী তাকে ঘরের আর এক কোণে ঠেলে ফেলে দিলেন। তারপর সেই বিবশ মূর্চ্ছিত অপরূপ দেহাধারটিকে অনায়াসে দুহাতে তুলে নিয়ে তিনি আর একবার সেই ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

রাবেয়া আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বসল। ঘরের এক কোণে মোমদানিতে একটা মোম জ্বলে জ্বলে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। রাবেয়া আর একটা নতুন মোম জ্বালল। তক্তাপোষের নিচে তার বাবার দেওয়া বড় একটা ঝাঁপিতে অনেক গাছড়া আর নানা রকমের ঔষুধের তেল ভরা রয়েছে। ফকির ব'লে দিয়েছে এগুলি তাকে সব রকম বিপদ আপদ অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা ক'রবে।

ঝাঁপিটা বার ক'রে কি একটু চিন্তা করল রাবেয়া। তারপর কয়েকখানা গাছড়া আর একটা তেলের শিশি তুলে নিল। চাবিটা তার বিছানার পাশেই প'ড়ে রয়েছে। তুলতে গিয়ে হাতটা যেন একটু কেঁপে উঠল। তারপর ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাল রাবেয়া। একটু কি ইতস্তত করল, হয়তো ভাবল তাঁকে ডেকে তাঁর অনুমতি নিয়েই যাবে। আবার কি ভেবে নিরস্ত হ'ল। তারপর চাবিটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর কোন ভয় নেই, কোন শঙ্কা নেই, অদ্ভুত সাহস এসেছে রাবেয়ার মনে। গাছড়ার ঝাঁপিতে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অলৌকিক দৈবশক্তি সে হাতে পেয়েছে। খোদার নির্দেশ শুনতে পেয়েছে হৃদয়ের মধ্যে সারারাত।

সারারাত দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে ভোরের দিকে চাঁদমিয়ার বোধ হয় একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, ঘরের মধ্যে আলো আর পায়ের সাড়ায় সে চমকে জেগে উঠল, চোখ মেলতেই দেখল রাবেয়া তার দিকে ছোট একটা শিশি হাতে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন ব্যাপারটা তার বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হ'ল না। কিন্তু পরক্ষণেই খানিকক্ষণ আগের ঘটনাটা তার মনে পড়ে যাওয়ায় সর্বাঙ্গের দুঃসহ যন্ত্রণা যেন

দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল। গূঢ় অভিমানে রাবেয়ার হাতখানা ঠেলে দিয়ে বলল, 'না'।'

ধাক্কা লেগে রাবেয়ার হাতের শিশিটা দূরে ছিটকে পড়ল। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্তে যেন বিমূঢ় হয়ে রইল রাবেয়া। তার পর হঠাৎ আঙুলের জলন্ত অঙ্গুরীয়টির দিকে তার চোখ পড়ল। দুই ঠোঁটে অদ্ভুত এক ঝিলিক হাসি ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে হাতের আংটিটা খুলে চাঁদমিয়ার একটা আঙুলে পরিয়ে রাবেয়া তেমনি দুর্বোধ রহস্যময় মৃদু হাস্যে বলল, 'এবার তো আর ওষুধে তোমার কোন আপত্তি নেই ?'

বিস্ময়ে আনন্দে চাঁদমিয়া নির্বাক হয়ে রইল। দেহ মনের কোন জ্বালার কথাই তার আর মনে পড়ছে না।

রাবেয়া উঠে গিয়ে সেই শিশিটা তুলে নিয়ে এল। তারপর হাতের তালুতে ঘন খানিকটা তেল ঢেলে ডান হাতের আঙুল ভিজিয়ে চাঁদমিয়ার মুখের ক্ষতস্থানগুলিতে বুলিয়ে দিতে লাগল। চাঁদমিয়া গভীর শান্তিতে চোখ বুজিল।

হঠাৎ পিছন থেকে একখানা বজ্রকঠিন হাত এসে রাবেয়ার কণ্ঠ চেপে ধরল। রাবেয়া মুখ ফিরিয়ে দেখতে পারল না, কিন্তু হাতের স্পর্শ সে চিনতে পারল।

চাঁদমিয়া চীৎকার ক'রে এগিয়ে আসতেই পায়ের ঠোকরে নশরৎ আলী তাকে ঘরের আর এক কোণে ঠেলে ফেলে দিলেন। তারপর সেই বিবশ মূর্চ্ছিত অপরূপ দেহাধারটিকে অনায়াসে দুহাতে তুলে নিয়ে তিনি আর একবার সেই ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

পরের দিন শোনা গেল অকস্মাৎ হার্টফেল ক'রে রাবেয়া মারা গেছে। সহরের ডাক্তারও সেই রিপোর্ট দিল। বাড়ির আত্মীয়স্বজন অনুচরেরা আর একবার নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। খবর পেয়ে থানার ইন্সপেক্টর চৌধুরী সাহেব বন্ধুবৎ সমবেদনা জানাতে এলেন এবং খানিকক্ষণ নিভৃতে নশরৎ আলীর সঙ্গে কি দু একটি কথাবার্তা ব'লে বিদায়ও নিলেন। রাবেয়াকে কবর দেওয়ার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ক'রতে নশরৎ আলীর ঘণ্টাখানেকের বেশী লাগল না। অনুচরেরা রাবেয়াকে তুলে নিয়ে গেল। নশরৎ আলি তাদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। চার বিবির কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস পেল না।

শূন্য ঘরের মধ্যে হঠাৎ এক দুঃসহ বেদনায় নশরৎ আলীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। চোখ ফেটে আসতে চাইল কান্না। কিন্তু নিজেকে নশরৎ আলী অনেক কষ্টে সংবরণ ক'রলেন। কান্না ছাড়া তার আরও এক কাজ এখনো বাকী আছে। যে কুকুর তাঁর রাবেয়াকে অশুচিস্পর্শে কলঙ্কিত ক'রেছে, তার চরম শাস্তি বাকী আছে এখনো। সে শাস্তি নিজের হাতে না দিলে নশরৎ আলির অন্তর শান্ত হবে না।

পরিজনেরা এখানে ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। নশরৎ আলী অলক্ষ্যে এক সময় সিঁড়ি বেয়ে সেই গুপ্ত গহ্বরের উদ্দেশ্যে নেমে চললেন।

হঠাৎ মসিয়র উঠে দাঁড়াল, বলল, 'ওঠ, এবার আমরাও চলি, অনেক কাজ আছে।'

আমি তার হাত ধ'রে টেনে বসালাম। 'উঠব মানে। আগে চাঁদমিয়ার কি পরিণতি হ'ল তাই ব'ল।'

মসিয়র রহমান সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রহস্যাত্মক ভঙ্গিতে হাসল, 'পরিণতিটা তেমন সুবোধ্য নয়, এখানে এসে গল্পটা কিছু অলৌকিক আকার নিয়েছে, মাঝখানের খানিকটা অংশ অত্যন্ত অস্পষ্টও হয়ে গেছে।'

অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'ভণিতা না ক'রে সংক্ষেপে বল চাঁদমিয়ার শেষ দশাটা কি হ'ল।'

মসিয়র বলল, 'শুনেছি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে নশরৎ আলীর চাঁদমিয়াই সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন। চাঁদমিয়া হাত ধ'রে তাকে রাবেয়ার কবরভূমিতে নিয়ে যেত, তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত' আবার রোজ সন্ধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে আসত বাড়িতে। শেষের দিকে দুজনের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক উঠে গিয়ে গভীর সৌহার্দের সৃষ্টি হয়েছিল।'

বললুম, 'হঠাৎ এরকম অভিনব কুটুম্বিতার কারণ।'

মসিয়র হেসে বলল: 'যারা ইয়াসিন ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস ক'রত তারা বলত ফকিরের গাছড়ার গুন। যে সব গাছড়া রাবেয়া চাঁদমিয়ার ঘরে ফেলে এসেছিল তা হাতে পেয়ে চাঁদমিয়া অসীম দৈববলে বলীয়ান হয়েছিল, নশরৎ আলীর জিঘাংসা তাকে স্পর্শও ক'রতে পারেনি।'

বললুম, 'আর যারা ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস করে না?'

মসিয়র বলল, 'তারা আমার টীকায় বিশ্বাস ক'রবে?'

'তোমার টীকাই শুনতে চাচ্ছি।'

মসিয়র বলল, 'নশরৎ আলী চাঁদমিয়াকে যে হত্যা করতে গিয়েও ক'রতে পারেননি, তা কোন গাছগাছড়ার জন্য নয়, চাঁদমিয়ার আঙ্গুলে পরিয়ে দেওয়া রাবেয়ার সেই আংটিটির জন্য। তার হাতে আংটিটি

দেখে নশরৎ আলী প্রথমে জলে উঠেছিলেন। বজ্রমুষ্টিতে সেই আংটি শুদ্ধ হাত তার চেপে ধ'রেছিলেন। এটা তাকে উদ্ধার ক'রতেই হবে। এটা রাবেয়ার শেষ স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়ে ছিল, শেষ চিহ্ন হ'লেও রাবেয়া তো তার হাতে সেটা দিয়ে যায়নি। দিয়ে গেছে তারই এই বীভৎস, শ্রীহীন অনুচরটির হাতে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদমিয়ার মুখের দিকে নশরৎ আলী তাকিয়েছিলেন। ক্ষতস্থানের মুখে মুখে রাবেয়ার দেওয়া সেই মলম শুকিয়ে লেগে রয়েছে। রাবেয়ার আঙুলের শেষ স্পর্শ। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে নশরৎ আলীর বোধ হয় মনে হয়েছিল রাবেয়ার অঙ্গুরীটির মত তার আঙ্গুলের স্পর্শগুলি স্মৃতি হিসাবে আরও মূল্যবান। সেগুলি রাখতে হ'লে চাঁদমিয়াকে রাখতে হয়, কেন না এক হিসাবে সেই রাবেয়ার জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন।'

হেসে বললাম, 'ফকিরের চেয়ে তোমার কেরামতি কম কঠিন নয় মসিয়র? কিন্তু নশরৎ আলীকে চাঁদমিয়া ক্ষমা করল কি ক'রে?'

মসিয়র কোন জবাব না দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

সংক্রামক

মাথা আঁচড়ে একটি একটি ক'রে কোটের বোতাম এঁটে এবার নিচু হ'য়ে সরযূ ছেলের জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছিল শশাঙ্ক এসে ঘরে ঢুকল। মুহূর্তকাল চোখ তেরছা করে সরযূ আর তার ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে শশাঙ্ক বলল, 'বাঃ, লাটের বেটার সাজখানা তো আজ দিব্যি মানিয়েছে।'

সরযূ একবার শশাঙ্কের দিকে চেয়ে আবার ফিতে বাঁধায় মন দিল। যেন সে আর তার ছেলে ছাড়া এ ঘরে তৃতীয় কোন মানুষ নেই।

কিন্তু শশাঙ্কের অস্তিত্ব অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার আরম্ভ করল।

'বলি, সাজিয়ে গুজিয়ে ছেলেকে এই ভর সন্ধ্যায় কোথায় পাঠাচ্ছ সরযূ ?'

সরযূ জবাব দিল, 'কোথায় আবার পাঠাব ? পার্কে খেলতে যাবে।'

শশাঙ্ক একটু হাসল, 'ও তাই বল, আমি ভাবলুম আমাদের কানাই বুঝি সেজে গুজে মজা লুটতে বেরুচ্ছে।'

বিস্ময়ে ক্রোধে এক মুহূর্ত হতবাক হয়ে থেকে সরযূ রুখে উঠল, 'আজ আবার মদ খেয়ে এসেছ বুঝি ?'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'ক্ষেপেছ, এই মাসের শেষে অত পয়সা কোথায়। বিশ্বাস না হয় মুখ শুঁকে দেখতে পারো ; ব'লে সত্যিসত্যিই শশাঙ্ক সরযূর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিল।

সরযূ সভয়ে দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ছি ছি ছি, চোখের মাথা একেবারে খেয়েছে। এত বড় ছেলে রয়েছে সামনে, লজ্জাও করেনা একটু।'

শশাঙ্ক বলল, 'ঠিক, ঠিক লজ্জা করাই তো উচিত। ভুলে গিয়েছিলাম এত বড় ছেলে তোমার সামনে। সত্যিই তো। তাহ'লে যাও তো বাবা কানাই, জুতোর ফিতে তো তোমার বাঁধা হয়ে গেছে, এবার তুমি বাইরেই যাও, দেখনা মা তোমার লজ্জায় ম'রে যাচ্ছে।'

ব'লে শশাঙ্ক সত্যিই কানাইর ঘাড়ে হাত দিয়ে অসঙ্কোচে তাকে

দোরের বাইরে ঠেলে দিল, তারপর তার মুখের সামনে সশব্দে দোর বন্ধ করে দিয়ে এসে তক্তপোষের উপর বসল।

কানাই ক্রুদ্ধ আক্রোশে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বন্ধ দরজায় লাথি মেরে বলল, 'শালা।' ব'লেই তাড়াতাড়ি দৌড়ে বেরিয়ে গেল পাছে শশাঙ্ক এসে ধ'রে ফেলে।

শশাঙ্ক কিন্তু দোর খুলবার একটুও চেষ্টা না ক'রে বলল, 'শোন একবার কথা শোন তোমার ছেলের। ন'বছর বয়সেই কি তেজ দেখছ, বড় হ'লে ও যুদ্ধের ক্যাপ্টেন হবে।'

সরযূ বলল 'হবেই তো,'

শশাঙ্ক হাসল, 'ও সেই ভরসাতেই আছ বুঝি। কিন্তু আর দু' একটা বছর যেতে দাও; সঙ্গে ক'রে নিয়ে পাড়া চিনিয়ে দিয়ে আসব। দেখবে ওর মুখে তখন কি রকম বুলি' বলে সরযূর থুথনি ধ'রে শশাঙ্ক কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠল, 'রাধে তুমি আমার প্রেমের গুরু,' তারপর আচমকা তাকে একেবারে বুকে চেপে ধরল।

সরযূ নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'ছাড়ো, ছাড়ো শিগগির আমাকে। কেন, কি ক'রেছি আমি তোমার যে দিনের পর দিন, ছেলের সামনে আমাকে তুমি এমন ক'রে অপমান করছ। আর ওই এক ফোঁটা ছেলে এত হিংসা তোমার তাকে। তোমার নিজের ছেলে যদি হোত—'

শশাঙ্ক বাধা দিয়ে বলল, 'আর সে যদি তোমার বোনের পেটে জন্মাতো তাহ'লে তুমিও ঠিক এমনিই করতে।'

সরযূ বলল, 'তুমি একটা পশু, নর-পিশাচ।'

শশাঙ্ক কোন কথা না ব'লে বিড়ি ধরাল, মেয়ে মানুষের এই রুষ্ট

বিক্ষুব্ধ রূপ দেখতে তবু এক রকম কিন্তু ওরা যখন পোষমানা বিড়ালের মত কোলের ওপর গা এলিয়ে দেয় তখন শশাঙ্ক কিছুতেই যেন তা আর সহ্য করতে পারে না। অথচ প্রথম যত বিদ্রোহই দেখাক, এক সময় না এক সময় ওরা পোষ মানবেই, এই সরযূই কি কম বাধা দিয়েছে, কম ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রেছে। কিন্তু এখন? একেবারে যেন সাতজন্মের বিয়ে-করা বউ। তার আচরণে কে এখন টের পাবে শশাঙ্ক সত্যিই তার পতি নয়, ভগ্নীপতি?

ভায়রা সুখময় তখনো বেঁচে। সেবার সস্ত্রীক ভায়রার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল শশাঙ্ক। খাওয়া দাওয়ার পর সরযূ পানের খিলি শশাঙ্কের হাতে তুলে দিচ্ছে—বলা নেই কওয়া নেই তার আঙুল শুদ্ধ শশাঙ্ক খিলিটা চেপে ধরল। যমুনা পাশেই দাঁড়ানো ছিল। রাগে এবং লজ্জায় দুই বোনের সুগৌর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে।

সরযূ ধমকের ভঙ্গীতে বলল, 'ছিঃ, এসব ইতর রসিকতা আমরা একটুও ভালোবাসিনা শশাঙ্ক। আমি যমুনার বড় বোন। সম্পর্কে তোমার দিদি, ঠাট্টা ইয়াকির লোক নয়! যাত্রা থিয়েটারে ঢুকে সভ্যতাভব্যতা একেবারেই বিসর্জন দিয়েছ।'

তারপর এই আটদশ বছরে কালচক্রের আবর্তনে সংসারে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। যক্ষ্মায় ভুগে এবং চিকিৎসায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে সুখময়ের মৃত্যু হয়েছে। আর স্বামীর অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যমুনা ক'রেছে গৃহত্যাগ।

দুর্ভিক্ষের বছরে ঘটিবাটি যেখানে যা ছিল বিক্রি ক'রেও যখন নিজের আর ছেলের দু'মুঠো ভাত জোগানো অসম্ভব হয়ে উঠল তখন

সরযূ অগত্যা শশাঙ্ককে তার কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লিখল, 'বলবার তো আর মুখ নেই, হতভাগী সকলের মুখে কালি দিয়ে গেছে। কিন্তু চক্ষুলজ্জার সময় তো এখন নয় ভাই। চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে না খাইয়ে খাইয়ে ছেলেটাকে যদি মেরেই ফেলি তখন তুমিই একদিন বলবে, এমন দশায় পড়েছিলেন দিদি আমাকে না হয় একটা চিঠিই দিতেন। তাই চিঠি দিয়ে অবস্থাটা সব তোমাকে খুলে জানালাম। এখন তোমার ধর্মে কর্মে যা লয় কোরো।'

এমন চিঠি আরো দু' তিন জনকে সরযূ লিখেছিল, লিখেছিল খুড়তুতো ভাইকে, দূর সম্পর্কের এক ভাসুরপোকে আর স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে। আর কি মনে ক'রে শেষে শশাঙ্ককেও লিখেছিল একখানা, কিন্তু কারো কাছ থেকে কোন জবাব এলো না। জবাব এলো কেবল শশাঙ্কের কাছ থেকে। শশাঙ্ক দশ টাকা মনিঅর্ডার ক'রে লিখেছে এভাবে আলাদা করে টাকা তুলে দেওয়া তো তার পক্ষে সম্ভব নয় তবে সরযূ যদি শশাঙ্কের বাসায় এসে থাকে এবং তার বুড়ো পিসিমার এক আধটু দেখা শোনা করে তাহ'লে কোন মতে গরিবভাবে সবাই মিলে থাকা যায়। পাড়াপড়শিরা বলল এমন সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। কিন্তু শশাঙ্কের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে বড় বদনাম শোনা গেছে যে। পরক্ষণে সরযূ নিজেই নিজের প্রতিবাদ করল। মানুষ কি আর চিরকালই এক রকম থাকে? বয়সের কালে এক আধটু ফচকেমি ফিচলেমি করেছে ব'লে এখনও কি আর শশাঙ্ক তাই করবে? তা ছাড়া সরযূরই বা এখন আর ভয় কিসের সেও তো এখন কচি মেয়ে নয়, ছেলেই তো তার এই ন' উৎরে দশ বছরে পড়ল, তারপর একবার কলকাতায় গিয়ে পড়তে পারলে

কত রকম কত সুবিধা সুযোগ জুটে যেতে পারে। আর ছেলেটাকে যদি কোন রকমে মানুষ ক'রে তুলতে পারে তাহ'লে আর দুঃখ কিসের সরযূর। কিন্তু সে সব কথা পরে। এখন সমূহ সমস্যা হ'চ্ছে ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবার। উপোষ ক'রে ছেলে যদি তার মরেই যায় তা হ'লে এই মান-সম্মান ধুয়ে কি জল খাবে সরযূ?

ষ্টেশনে শশাঙ্ক উপস্থিত ছিল। কিন্তু সরযূর চেহারা আর সঙ্গে তার অত বড় ছেলে দেখে শশাঙ্কের সমস্ত উৎসাহ যেন নিভে এলো। একবার ভাবল এখান থেকেই বিদায় ক'রে তারপর মনে করল ক'দিন না হয় একটু পরখ ক'রে দেখা যাক আজকাল কতখানি ঠাট্টা ইয়ার্কি হজম করবার সরযূর শক্তি হয়েছে। তাছাড়া যে যমুনা তাকে এমন ভাবে জব্দ ক'রে গেছে তার খানিকটা শোধও তো শশাঙ্ক তুলে নিতে পারবে, যমুনার ওপর শোধ তুলবার সুযোগ কি জানি জীবনে যদি একবারে নাই-ই আসে।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটবাড়িতে শশাঙ্ক নিয়ে তুলল সরযূ আর তার ছেলেকে। দুখানা ছোট ছোট থাকবার ঘর, একটা পাকের ঘর, আর একটা বাথরুম। সরযূকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিল শশাঙ্ক। এত সুখ সুবিধার কথা সে ভাবতেও পারেনি।

একটু বাদে সরযূ বলল, 'কই, তোমার পিসিমা কোথায় শশাঙ্ক? তাঁকে তো দেখছিনে।'

শশাঙ্ক মুখ মুচকে হেসে বলল, 'তাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছি। বুড়ী ভারী ঝগড়াটে। আপনি তার সঙ্গে কিছুতেই বনিয়ে থাকতে পারতেন না সরযূদি।'

সরযূ বলল, 'এ তোমার কি রকম কথা হোল শশাঙ্ক। তার সঙ্গে আমার অবনিবনাও হওয়ার কি আছে। তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'করলামই বা, এক আধটু ঠাট্টা ইয়াকি তো আমাদের মধ্যে চলতেই পারে।'

'তোমার পিসিমা তাহ'লে তোমার সঙ্গে এখন থাকেন না?'

'কোন কালেই না। পিসিমা বলেই যে কেউ আমার নেই সরযূদি।

'তা হ'লে কে এখানে আর থাকতো। বিয়ে থা তো তারপর আর করোনি শুনেছি।'

শশাঙ্ক বলল, 'সে ঠিকই শুনেছেন যা হয়ে গেল তারপরও আবার বিয়ে? কিন্তু নিতান্ত মেয়েছেলে না হ'লে নাকি পুরুষের চলেনা সেই জন্যই তমাললতাকে কিছুদিন রেখে ছিলাম, আপনি আসবেন ব'লে তাকে বিদায় করেছি।'

সরযূ জিজ্ঞাসা করল, 'তমাললতা আবার কে।'

শশাঙ্ক বলল, 'এই পাপমুখে সে কথা বলতে লজ্জা করে। শত হ'লেও তো যমুনার আপনি বড় বোন, সম্পর্কে গুরুজন।'

সরযূ নির্বাক হয়ে গেছে, ইচ্ছা ক'রেছে তখনই ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু রাস্তার দিকে তাকিয়ে তার ভয়ে বুক কেঁপেছে, কিলবিল করে কেবল অচেনা মানুষ আর মানুষ। কে জানে, এর প্রত্যেকটিই হয়তো একেকজন শশাঙ্ক, তার চেয়ে এই চেনা শশাঙ্কই ভালো, যত ঠাট্টা তামাসাই করুক একেবারে যা তা কিছু তো আর করতে পারবে না, গলায় তো ছুরি বসাতে পারবেনা আর।

কিন্তু ঠাট্টা তামাসা ধাপের পর ধাপ চড়াতে চড়াতে দু' তিন দিন পরেই শশাঙ্ক যখন তাকে একেবারে বুকে চেপে ধরল সরযূ মনে মনে ঠিক করল আর নয় এবার ছেলেকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে, পৃথিবীতে ভয় করবে সে কাকে, কিসের জন্যই বা? আর তার কি অবশিষ্ট আছে হারাবার?

ঘুমন্ত ছেলেকে জাগিয়ে সরযূ চুপে চুপে বলল, 'চল কানাই এখানে আর আমরা থাকবনা।'

কানাই সোৎসাহে বলল, 'চলো।'

ছেলের হাত ধ'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একেবারে সদর দরজা পর্যন্ত এসে থেমে দাঁড়াল সরযূ, অসংখ্য গাড়ী ছুটে চলেছে রাজপথে, রাত্রির অন্ধকারে তাদের আলোগুলি জলছে রূপকথার রাক্ষসের চোখের মত।

কানাই বলল, 'কই মা চল।'

সরযূ তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'যাব বাবা, যাব, তুই আর একটু বড় হয়ে নে, তারপর তো যাবই।'

কানাই বলল, 'বড় তো আমি হয়েছি মা।'

সরযূ হেসে বলল, 'আরও একটু বড় হ'তে হবে যে বাবা।'

সরযূ ফিরে এল, সত্যিই তো, হারাবার আর তার কি আছে, ভয় করবার আর তার কি আছে যে সে এমন মরীয়া হয়ে গাড়ী চাপা পড়তে যাচ্ছিল? তার অদৃষ্টে যা হবার তা যখন হয়েছেই তখন এই সুযোগে ছেলেকে কেন বড় ক'রে তুলবেনা সরযূ, পরের পয়সায় তাকে মানুষ ক'রে তুলবার সুযোগ কেন আর সে হাতছাড়া করবে?

তারপর বিনা বাধায় বিনা আপত্তিতে সরযূ যখন তার সমস্ত আদর সোহাগ গ্রহণ করল তখন শশাঙ্ক নিজেই বিস্মিত না হয়ে পারলনা।

একে অল্পতেই যে পোষ মানবে সরযূ তা সে আশা বরং আশঙ্কা করেনি, আর এই নিতান্ত সাধারণ রূপহীনা গতপ্রায় যৌবনা সরযূর মত মেয়ে যদি পোষ মানল, যদি শশাঙ্কের এই সব অবৈধ আদর আহ্লাদ বৈধ বলেই মেনে নিল তা হ'লে আর রস রইল কোথায়। ঝাঁঝের মধ্যেই তো মদ আর মেয়ে মানুষের যত মাধুর্য।

যাকে দিদি বলে ডাকতে হোত গুরুজন বলে সমীহ ক'রে চলতে হোত এমন কি সময় বিশেষে পা ছুঁয়ে প্রণাম পর্যন্ত করতে হোত মুখের ওপর তাকে নাম ধরে ডাকতে পারার মধ্যেই একটা নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতার স্বাদ আছে।

সরযূ দু' একদিন মৃদু আপত্তি করে বলেছিল, 'ছিঃ অমন ক'রে নাম ধরে ডেকোনা বড় লজ্জা করে আমার, বরং কানাইয়ের মা ব'লে ডেকো।'

শশাঙ্ক জবাব দিয়েছিল, 'সে কানাইর বাবা হ'লে ডাকত।'

আরো কয়েকদিন বাদে সরযূ আবার বলল, 'আচ্ছা নাম ধ'রে ডাকতে চাও ডাক কিন্তু তাই ব'লে কি অত বড় ছেলের সামনেও ডাকবে? শত হ'লে চক্ষুলজ্জা বলেও তো কিছু আছে মানুষের? ন' দশ বছরের ছেলে। ও না বোঝে কি?'

ফলে শশাঙ্ক নতুন খেলার সন্ধান পেয়ে গেল, সরযূর যাতে লজ্জা শশাঙ্কের তাতেই আনন্দ। কানাইর কাছে সরযূকে তো সে নাম ধ'রে ডাকে মাঝে মাঝে অনুরাগের এমন বাহ্য প্রকাশ করে যে রাগে আর ঈর্ষায় ন' বছরের ছেলে কানাইর চোখ জ্বলতে থাকে আর অসহায় অপমানে আর লজ্জায় আধাবয়সী সরযূর ফ্যাকাসে মুখ রক্তে যেন ফেটে পড়তে চায়, ভারি অপূর্ব দেখতে সে জিনিস, ভারি মজার।

উল্টোরথ

থিয়েটারে পার্ট করে শশাঙ্ক, মাঝে মাঝে সিনেমাতেও নামে, অভিনয়ে তার নাম আছে, আর শুধু যশ নয় টাকাও সে পকেট ভ'রে আনে।

একদিন তার মনে প্রশ্ন এলো এত টাকা দিয়ে করে কি সরযূ, দামী কাপড় চোপড় গহনা পত্র কিছুতেই সরযূকে পরানো যায়নি, যদি বা শশাঙ্কের জোর জবরদস্তিতে পরেছে কোনদিন তার পর মুহূর্তেই আবার ছেড়ে ফেলেছে। কোনদিন নিজের জন্য কোন জিনিস তাকে আনতে বলেনা সরযূ নিজে হাতে ক'রে যে কেনে তাও নয়। যমুনা, মালতী, যুঁইফুল, তমাললতা সবারই এই বেশবাসের দিকে ঝোঁক ছিল; ব্যতিক্রম কেবল সরযূ।

তারপর একটু সতর্ক হয়ে লক্ষ্য ক'রতেই অবশ্য টাকার খোঁজ মিলল। ছেলের জন্য দামী দামী রকম বেরকমের জামা কাপড় জুতো—পাঠ্য বই কয়েক খানা ছাড়াও চমৎকার ছবিওয়ালা সব বই, বাঁধানো মোটা মোটা খাতা, দামী কাঁচের দোয়াতদানি, কলম, রঙীন পেনসিল আর রকমারী সব খেলনায় সরযূর ঘর একেবারে ভ'রে গেছে, খোঁজ নিয়ে জানা গেল সরযূর তত্ত্বাবধানে কানাইর নামে পাড়ার ব্যাঙ্কে একটা এ্যাকাউণ্ট পর্যন্ত আছে।

শশাঙ্ক মনে মনে হাসল। তাহ'লে সরযূকে সে যত বোকা ভেবেছিল তা তো সে নয়। শিখিয়ে পড়িয়ে ছেলেকে দিব্যি মানুষ ক'রে তুলছে, কানাই তার একমাত্র আনন্দ ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা, তারপর একদিন হয়তো এই কানাইকেই সে লেলিয়ে দেবে শশাঙ্কের ওপর, তার সমস্ত অপমানের শোধ তুলবে।

এরপর শশাঙ্ক বেশ একটু সতর্ক হয়ে চলতে চেষ্টা করল। টাকা

পয়সা আর তেমন ক'রে দেয় না। সামান্য কারণে কানাইর কান ম'লে দেয় গাল টেনে ধরে। এ যেন দুই নখের মধ্যে টিপে ছার-পোকা মারার আনন্দ।

একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে শশাঙ্ক পার্টের রিহার্সাল দিচ্ছে হঠাৎ জানালা দিয়ে তার চোখ পড়তেই দেখল কানাই বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিকৃত মুখভঙ্গিতে তাকে ভেংচাচ্ছে—দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল শশাঙ্কের।

'তবেরে বাঁদরের বাচ্চা!' ব'লে শশাঙ্ক রুদ্রমূর্তিতে ঘর থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল, পড়ি কি মরি ক'রে কানাইও দিল ছুট। শশাঙ্ক ছুটল তার পিছনে। ধরা পড়বার ভয়ে কানাই দু' তিনটা সিঁড়ি এক লাফে ডিঙাতে চেষ্টা করতেই কি ক'রে তার পা ফসকে গেল এবং গোটা বিশেক সিঁড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে একবারে মাটিতে এসে পড়ল।

গেছে গেছে ক'রে সরযূ এল ছুটে, ততক্ষণে কানাই সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে আর ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে মাথা থেকে।

এ্যাম্বুলেন্স্ এল, কানাই গেল মেডিক্যাল কলেজে। ডাক্তারদের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল অবস্থা গুরুতর। এরপর সরযূর মুখের দিকে তাকাবার আর সাহস হোল না শশাঙ্কের।

দিন দুই পরে কানাইর জ্ঞান ফিরল, সরযূ আর শশাঙ্ক দু'জনেই উৎকণ্ঠিত মুখে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

অস্ফুটস্বরে কানাই ডাকল, 'মা!'

সরযু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'এই যে বাবা।'

কানাই বলল, 'বাবা কোথায়।'

শশাঙ্ক এগিয়ে এসে কানাইর বিছানার পাশে বসল, তারপর তার ছোট রোগজীর্ণ হাতখানি নিজের মুঠির ভিতর নিয়ে বলল, 'কেন বাবা, এই যে আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে তার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে যেন একটা অভূতপূর্ব চমক খেলে গেল।

অপাঙ্গে একবার তাকাল শশাঙ্ক সরযুর দিকে তার জলভরা চোখে লজ্জার এক অপূর্ব রঙ লেগেছে। কানাই বলল, 'আমি বাড়ী যাব!'

শশাঙ্ক বলল, 'যাবেই তো, কালই তো তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।'

কানাই একটু ভীত দৃষ্টিতে শশাঙ্কের দিকে তাকাল আর মারবে না তো?'

শশাঙ্ক কানাইর দুর্বল ছোট মুঠিটুকু হাতের মধ্যে চেপে ধরে সস্নেহ হাস্যে বলল, 'দুষ্ট ছেলে! মারব কেন?'

তারপর শশাঙ্ক আর কানাই-এর অন্তরঙ্গতা দিনের পর দিন এমন গভীর হ'তে লাগল যে সরযু অবাক হয়ে গেল। কিছুদিন আগেও যে এরা পরস্পরকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চোখে দেখত তা এখন কে বিশ্বাস করবে। শশাঙ্ক যেন নতুন জন্ম নিয়েছে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে কানাইকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করে না। খাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে, শোয়ার সময় পাশে নিয়ে গল্প করে।

বেশির ভাগ সময় শশাঙ্কের আজকাল কানাইকে নিয়েই কাটে। সকালে বিকালে পড়তে বসায়। কোন দিন বা নিয়ে যায় সিনেমায় কোন দিন বা খেলার মাঠে। যেদিন বেরুতে পারে না সেদিন ব'সে ব'সে ছেলেমানুষের মত কানাইর সঙ্গে ক্যারমবোর্ড খেলে।

সরযূ একদিন বলল, 'তোমার হয়েছে কি আদর দিয়ে দিয়ে যে ছেলেটার মাথা খাচ্ছ।'

শশাঙ্ক পরম বিজ্ঞের মত বলল, 'ওটা তোমার ভুল, আদর যত্নে ছেলেরা ভালোই হয়।' তারপর একটু হেসে বলল, 'বিগড়োয় কেবল মেয়েরা।'

সরযূ বলল, 'আহা।'

সেদিন কানাইকে নিয়ে শশাঙ্ক সিনেমা দেখতে যাবে। বইখানায় শশাঙ্কেরও ভূমিকা আছে। এর আগে সরযূ কোনদিন শশাঙ্কের সঙ্গে সিনেমায় যায়নি, কোথাও বেড়াতেও বের হয় নি। শশাঙ্কের বহু অনুরোধ উপরোধ তিরস্কার ভর্ৎসনাতেও নয়। কোন বড় রকমের বাধা শশাঙ্ককে দেওয়ার শক্তি তো নেই, তবু যে কোন উপায়ে ছোটখাট ইচ্ছার বিরোধিতা ক'রে সরযূ অপূর্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

কিন্তু আজ যখন কানাইকে নিয়ে শশাঙ্ক বেরুবার আয়োজন করেছে সরযূ নিজেই এসে ছদ্ম অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'বলি যাওয়া হচ্ছে কোথায়? সব সলা পরামর্শ কেবল ছেলের সঙ্গে! কানু ছাড়া এ বাড়ীতে আর কেউ থাকেনা বুঝি।'

এই অভিমানের অভিনয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটু বেদনার আভাস ছিল এমন কি কানাইর কানেও তা ধরা পড়ল। কানাই

একবার মার দিকে চেয়ে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল তারপর শশাঙ্ককে বলল 'মাকেও নিয়ে চল বাবা' বলেই কানাই তাড়াতাড়ি লজ্জায় মুখ ফিরাল। চুক্তিভঙ্গের লজ্জাজনক সম্বোধনটা এতদিন শশাঙ্ক আর কানাইর মধ্যে একটি গোপন রত্নের মত ছিল। সেই গোপনতার মধ্যে কত কৌতুক, কত রহস্য।

শশাঙ্ক এক মুহূর্ত সেই লজ্জিত কিশোর কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জার বিচিত্র প্রকাশ শশাঙ্ক কত প্রণয়িণীর আনত চোখে আর আরক্ত কপোলে নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে দেখেছে কিন্তু তা কি এত মধুর, এত নয়নাভিরাম?

কানাইকে শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তার অপ্রতিভ মুখখানি নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে সরযূর দিকে চেয়ে সকৌতুক হাস্যে বলল, 'আমাদের কানাই মহারাজের যখন আদেশ তখন তো তার মাকে নিতেই হয় সঙ্গে কি বলো?'

কিন্তু সরযুর চোখে কৌতুকও নেই, আনন্দও নেই, তার দুই চোখে আবার সেই প্রথম দিনের ঘৃণা আর বিদ্বেষ জ্বল জ্বল ক'রে উঠেছে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে নীরস রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'হুঁ, এই সবই বুঝি আজকাল শেখান হচ্ছে ছেলেকে? তারপর কানাইর দিকে ফিরে বলল, 'কানাই সিনেমায় তোমার আজ যাওয়া হবে না।'

কানাই মুখ তুলে মার দিকে তাকাল, 'বাঃরে বললেই হোল যাওয়া হবে না। তোমার কথাতেই হবে বুঝি?'

সরযূ ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল ছেলের দিকে তাকিয়ে

থেকে বলল, 'না তা আর হবে কেন? হতভাগা কোথাকার এখন থেকে তোমার কথাতেই সব হবে।' ব'লে সরযূ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শশাঙ্ক সস্নেহ ধমকে বলল, 'ছিঃ, মার সঙ্গে অমন করে কথা বলে বুঝি? মা হোল সকলের চেয়ে গুরুজন জানো না।'

যেতে যেতে কথাটা কানে যাওয়ায় অতি দুঃখেও হাসি পেল সরযূর। ভণ্ডের মুখে মহাভারত। মায়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে না করবে তাও সরযূর ছেলেকে আজ শশাঙ্কের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।

সরযূ সেই যে গিয়ে ঘরে খিল দিয়েছে অনেক সাধ্যসাধনায়ও শশাঙ্ক তা খুলতে পারল না। এদিকে কানাই নাছোড়বান্দা সে যাবেই রাগে আর অভিমানে বারবার তার দুটি কোমল সুন্দর ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে।

শশাঙ্ক অবশেষে বলল, 'আচ্ছা চল।'

বুক ফেটে সরযূর কান্না এল। বহুদিন পরে আজ আবার তার স্বামীর কথা মনে পড়েছে! অকৃতজ্ঞ ছেলের নির্লজ্জতার লজ্জায়, ধিক্কারে সরযূর ম'রে যেতে ইচ্ছা করল। জাগল একে একে সমস্ত কথা, সমস্ত ইতিহাস তার মনে; দিনের পর দিন কি অত্যাচার কি লাঞ্ছনা কি অপমানই না শশাঙ্কের কাছ থেকে দু' হাত ভ'রে গ্রহণ ক'রেছে সরযূ। একমাত্র ঐ ছেলের দিকে চেয়ে। সে বড় হলে আর কোন দুঃখ থাকবে না সরযূর। জীবনের যত গ্লানি যত লজ্জা সব কানাইর ভক্তি আর ভালোবাসার অজস্র ধারায় নির্মল হয়ে যাবে। আর কেউ না বুঝুক বড় হ'লে কানাই তো বুঝবে সরযূর এই আত্ম-

ত্যাগের মূল্য। সে নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারবে কেবল তার জন্যই সরযূ দিনের পর দিন এই অপমানের দুঃসহ জীবনের ভার বয়ে চলেছে। কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই মরতে সরযূর মন যায় নি।

কিন্তু আজ যেন নতুন দৃষ্টি খুলে গেল সরযূর। জলভরা চোখের সামনে ভবিষ্যতের যে মূর্তি ফুটে উঠল তাতে আঁৎকে উঠল সরযূ। এই তো কেবল সুরু। এর পর একটু বড় হ'লে কানাই মুখের ওপরই তাকে অপমান করা আরম্ভ করবে। আচারে আচরণে চোখের দৃষ্টিতে মুখের ভাষায় মায়ের ওপর তার ঘৃণা আর অবজ্ঞা ঝ'রে ঝ'রে পড়বে। ছি ছি ছি এমন ভুল কি ক'রে করল সরযূ। কেন তখনই বেরিয়ে গেলনা ছেলের হাত ধ'রে। কেন আত্মহত্যা ক'রে মরল না। এত মোহ, এত ভালবাসা এই ছার জীবনের ওপর।

সরযূর দু চোখ আবার জলে ভ'রে উঠল। ধিক্কারে অনুশোচনায় নিজেকে সে যেন নিশ্চিহ্ন করতে পারলে বাঁচে। এই বছর কয়েকের মধ্যেই ম্লান হয়ে আসা স্বামীর মুখ মনে আনতে চেষ্টা করল, সুখময় যেখানে যে লোকেই থাক তার কাছে তো গোপন নেই তাদের ছেলেকে অনাহার থেকে বাঁচাতে গিয়েই সরযূর আজ এই দশা।

শশাঙ্কের বহু অনুরোধ উপরোধে হাতে দু গাছা করে চুড়ি আর সোনার সরু এক গাছা হার ব্যবহার করা আরম্ভ ক'রেছিল সরযূ। আজ তা খুলে ফেলল, তারপর তার চোখে পড়ল বেশ খানিকটা চওড়া লালপেড়ে শাড়ী তার পরণে। লজ্জায় ঘৃণায় সরযূর মনে হ'তে লাগল পাড়টাকে টুকরো টুকরো করে সে ছিঁড়ে ফেলে। শশাঙ্ক কিছুতেই সাদা থান পরতে দেবে না। তাই চুল পাড় থেকে ইঞ্চি

পাড় ইঞ্চি পাড় থেকে একরত্তা চওড়া লাল কি কালো পেড়ে শাড়ী সরযূকে বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই অন্য সব দামী নক্‌সা পাড় শাড়ী শশাঙ্ক সরযূকে পরাতে পারে নি। ওইটুকু কৃচ্ছ্রতা ওইটুকু অবাধ্যতা দিয়ে সরযূ নিজের কাছে ন্যায় এবং নীতির খানিকটা মর্যাদা রাখতে চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু আজ এই লালপাড়-টুকু সরযূর কাছে নিজের সমস্ত পরাজয়, সমস্ত অপমানের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল যে দুখানি সাদা থান সে আসবার সময় নিয়ে এসেছিল তা এখনো আলমারীর এক কোণায় শশাঙ্কের দেওয়া অব্যবহৃত অসংখ্য বিলাস উপকরণের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে আছে। সরযূর মনে হোল একমাত্র সেই শুভ্র শুচিবাসে তার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত লাঞ্ছনা ঢাকা পড়বে।

সরযূ আঁচলের চাবির গোছা থেকে চাবি বের ক'রে শশাঙ্কের দামী কাঁচের আলমারী খুলে ফেলল।

তাক ভ'রে রঙ বেরঙের শাড়ী আর সেমিজ ব্লাউস আর পেটিকোট। এক মুহূর্তে সেই রঙীন বৈচিত্রের দিকে সরযূ মুগ্ধ বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল, এত রঙ পৃথিবীতে, আর রঙে এত আনন্দ, এতদিন সরযূ কি চোখ বুজেছিল। ধীরে ধীরে এক একটি ড্রয়ার খুলে ফেলল সরযূ, কোনটিতে অলঙ্কার, কোনটিতে প্রসাধনের নানা মূল্যবান সামগ্রী, এ পর্যন্ত কিছুই সরযূ স্পর্শ করেনি। আজ প্রতিটি জিনিষ বার বার ক'রে সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগল, সব তার, সব কেবল সরযূর জন্য সব, সমস্ত পৃথিবী।

সিনেমা থেকে কানাইকে নিয়ে ফিরে এল শশাঙ্ক। উল্লাসে আর আনন্দে কানাই যেন ফেটে পড়ছে।

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'তা হ'লে সত্যিই তোর খুব ভালো লেগেছে কানু ?'

কানাই সোৎসাহে বলল, 'চমৎকার, আর সাহেবের বেশে এমন মানিয়েছিল তোমাকে, তারপর তুমি যখন বন্দুক নিয়ে একা একা অমন অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলে আর গুণ্ডাটা লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার পিছু নিল আমি তো ভয়েই অস্থির। এমন বোকা তুমি। গুণ্ডাটাকে তুমি কেন আগেই দেখতে পেলেনা আমি তাই ভাবি।'

শশাঙ্ক সস্নেহে কানাইয়ের কাঁধে হাত রেখে মৃদু হাসল। এমন তৃপ্তি এত আনন্দ শশাঙ্ক যেন আর কখনো জীবনে পায়নি। কত গুণমুগ্ধ ভক্তের কাছ থেকে কত অভিনন্দন কত প্রশংসা এসেছে, পাশে ব'সে কত নারী তাদের অপরূপ বিচিত্র ভঙ্গিতে শশাঙ্কের অভিনয় নৈপুণ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছে কিন্তু কারো কণ্ঠেই কি এত আন্তরিকতা ছিল, এত মাধুর্য ? এর আগে কি কারো দুটি আনন্দোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের অমরত্ব সম্বন্ধে শশাঙ্ক এমন নিঃসংশয় হ'তে পেরেছে ?

গভীর স্নেহে কানাইকে কোলের মধ্যে টেনে নিল শশাঙ্ক, মধুর বাৎসল্যে তার অন্তর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

হঠাৎ কানাই চমকে উঠে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'মা।'

শশাঙ্কও মুখ তুলে দেখলে সামনে সরযূ।

কিন্তু একি বেশ তার সেই পরিচিত অনাড়ম্বর সজ্জা কোথায়

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শাড়ীর জমকালো রঙে অলঙ্কারের প্রাচুর্যে, প্রসাধনের অপটু আতিশয্যে সরযূকে আর চিনবার জো নেই।

শশাঙ্ক আর কানাই দুজনেই বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সরযূ একটু মুচকি হাসল, 'সিনেমা দেখা হয়ে গেল তোমাদের ?'

শশাঙ্ক বলল, 'হুঁ,'

'তুই কেমন দেখলিরে কানাই ?'

কানাই কোন জবাব দিলনা, নির্বাক বিস্ময়ে এবং খানিকটা কৌতুক ও কৌতূহলের চোখে সে মাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। ছেলের চোখকে অবজ্ঞা ক'রে সরযূ শশাঙ্কের দিকে তাকাল, তারপর প্রগল্ভ তরল কণ্ঠে বলল, 'কি মুখে যে একেবারে রা নেই। খুব খারাপ লাগছে নাকি দেখতে ?'

শশাঙ্ক ইঙ্গিতে একবার কানাইকে দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ ওর উপস্থিতিতে এসব প্রসঙ্গ আলোচ্য নয়।

কিন্তু সরযূর কোন দিকে কোন খেয়াল নেই, সে যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে জীবনে, নতুন নেশা।

সরযূ তেমনি তরল স্বরে বলল, 'বাঃরে এতদিন পর তোমার পছন্দ মত ক'রে সাজলুম, একবার মুখ ফুটে বললে না কেমন লাগছে।'

শশাঙ্ক বিব্রত এবং বিমূঢ় ভাবে সরযূর দিকে তাকাল। হঠাৎ কি হয়েছে সরযূর ? টনিকের বদলে ভুল ক'রে অন্য কিছু খেয়ে বসেনি তো ? কিন্তু ভুল করবার মেয়ে তো সরযূ নয়, যদি ক'রে থাকে ইচ্ছা ক'রেই করেছে, কিন্তু কেন হঠাৎ এমন দুর্মতি হ'ল সরযূর ?

সরযূ এবার এগিয়ে এসে শশাঙ্কের হাত ধ'রে আস্তে একটু নাড়া দিল, 'বলো না গো, না হ'লে আমি সব কিন্তু আবার ছেড়েছুড়ে ফেলব।'

শশাঙ্ক এবার কানাইর দিকে তাকাল, 'যাও তো কানাই, ওঘরে গিয়ে ছবির এ্যালবামটা দেখতো ততক্ষণ, আমি এখুনি আসছি।'

সরযূ খিল খিল করে হেসে উঠল, 'ওমা, তাই বল, কানুকে দেখে তোমার এত লজ্জা, আহাহা, ও যেন আর জানেইনা কিছু। মিটমিটে শয়তান।'

যথাস্থান

ভোরেও ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়েই থাকে। কোন দিকে কোন ফাঁক নেই আলো আসবার। একটি মাত্র জানালা আছে পশ্চিমের দিকে কিন্তু সেটিও খুলবার জো নেই। জানালার ওপারেই সেই বাবরিকাটা মুসলমান ছোকরাটির বিড়ির দোকান। মাঝখানে মাত্র দেড়হাত গলি। ইচ্ছা করলে একটু এগিয়ে এসে শিকের ফাঁক দিয়ে সে উমার আঁচলও টেনে ধরতে পারে। ইচ্ছা যে ওর করে না তা নয় কিন্তু অতখানি সাহস আজও হয়নি। তবে হ'তে কতক্ষণ। স্পর্ধা ওর দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। জানলা একটু খোলা পেলেই উমার দিকে তাকিয়ে সে হাসে, চোখের ইসারায় অনুরাগ জানায়, আজকাল শিস্ দিয়ে গানও আরম্ভ ক'রেছে, 'চোখে চোখে রাখি হায়রে।'

বউদি সুলতা আধো সুরে বাকি কলিটুকু গেয়ে দেয়, 'তবু

জোরে ধরা যায় না।' আহাহা, বেচারার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে, গলা ভেঙে যাচ্ছে—ধরা তাকে একটুখানি দাও না ঠাকুরঝি।'

উমা বলে, 'মর তুমি। এত দয়া থাকে তুমি ধরা দিলেই পার।'

সুলতা বলে, 'আহাহা আমাকে তো আর চায় না। জানে কিনা যে আমার একজন আছে।'

উমা চুপ ক'রে যায়। একজন তার নেই। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই সে বিদায় নিয়েছে।

সুলতা বুঝতে পারে, কথাটি ভালো হয়নি। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে অত হিসাব ক'রে ক'রে কি আর কথা বলা যায়, না বলতে ভালো লাগে।

তবু সুলতা কথাটা আবার ঘুরিয়ে নেয়, 'তাছাড়া আমি ধরা দিলে তোমার দাদার দশাটি কি হবে তা ভাব দেখি।'

উমা বিরক্ত হয়ে বলে, 'থাক বউদি, ওসব ইতর রসিকতা আমার ভালো লাগে না। দাদাকে বলো না বাড়িটা বদলাতে। মাগো, এমন পাড়ায় ভদ্রলোক থাকে। আর এখানে এসেছি তো ছ'মাস হয়ে গেল, এর মধ্যে অন্য কোন জায়গা পাওয়া গেল না শহরে?'

সুলতাও বিরক্ত হয়, 'পাওয়া গেলে কি আর সাধ ক'রে এখানে কেউ থাকে ঠাকুরঝি! ভালো বাড়িতে থাকবার ইচ্ছা সকলেরই করে। কিন্তু দেখছ তো চোখে, মরবারও কি সময় আছে মানুষটার!'

উমা চুপ ক'রে থাকে, দাদার সম্বন্ধে কিছু বললেই বউদি ভয়ঙ্কর বিরক্ত। দাদার ওপর অভিমান করবারও যেন কোন অধিকার নেই উমার। তাকে ভালোও বলবে বউদি, মন্দও বলবে বউদি—কেবল উমাই কিছু বলতে পারবে না, সংসারে কেবল উমারই সব কথা একেবারে অবান্তর।

বেলা নটায় টিউসনি শেষ ক'রে ঘরে ফিরল প্রফুল্ল। এই একটি ঘণ্টার মধ্যে নেয়ে খেয়ে দশ মিনিট পথ উল্টো হেঁটে ট্রাম ডিপোতে পৌঁছে সেখান থেকে অফিসের ট্রাম ধরতে হবে। কেন না মাঝপথ থেকে ট্রামে ওঠা—এক মল্লযুদ্ধের ব্যাপার। যুদ্ধে সব দিনই যে জয়ী হওয়া যাবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এক সপ্তাহের মধ্যেই একদিন গেছে পকেট কাটা আর একদিনের হাতাহাতির ফলে নতুন কেনা জামার হাতাটা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সুতরাং কিছু দিন থেকে প্রফুল্ল হটতে সুরু করেছে। এতে খানিকটা হাটতে হয় বটে—কিন্তু ভিতরে গিয়ে নির্বিবাদে ব'সে যাওয়া যায়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢুকে জানলাটা খুলে দিতে দিতে স্ত্রীকে বল্ল, 'দিন দুপুরে কি ডাকাত পড়বে না কি ঘরে? এমন গরম আর অন্ধকারের মধ্যে দোর জানালা বন্ধ ক'রে কি দম আটকে মরবে?'

সুলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'মরলে তো বাঁচতুম। কিন্তু তুমি ভেবেছ কি? অন্য কোথাও ঘর দোর দেখবে না, এই হতচ্ছাড়া পাড়াতেই চিরটা কাল কাটিয়ে যাব।'

স্ত্রীর কথায় কোন জবাব না দিয়ে প্রফুল্ল বোনের দিকে তাকায়, 'আজও আবার বাঁদরামি করেছে না কি ছোঁড়াটা? কাল যে অত ক'রে ধমক দিলাম তাতেও আক্কেল হোলো না!'

উমা মনে মনে কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ করে। কথাটা দাদা বউদির কাছে শুনলেই পারতেন, সরাসরি তাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন।

সুলতার আক্রোশ যায়নি, বলল, 'ধমক! ধমক দিতে তুমি জানো? ধমক দেওয়ার মত জোর আছে তোমার গলায়!'

'যতটুকু ছিল, তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেই তা গেছে।'

উমা বিব্রত হয়ে বলে, 'চান ক'রতে যাও দাদা, অফিসে কিন্তু আজ আবার লেট হয়ে যাবে।'

প্রফুল্ল বলে, 'ধুত্তোর অফিস। চল্ উমা, দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকি। চল্লিশ টাকার শহুরে জীবন আর নয়। দু'চার বিঘা যা জমি আছে চাষ আবাদ ক'রে খাব।'

উমা মনে মনে হাসে। অফিসে লেট হবার সম্ভাবনা দেখলেই এ কথা প্রফুল্ল প্রায়ই বলে। এখনো মাঝে মাঝে দেশের বাড়িতে ফিরে যেতে চায় প্রফুল্ল। এখনো এক মন তার গাঁয়ের জন্য কাঁদে কিন্তু আর এক মন ফের এই গলিতে এসে বাসা বাঁধে।

অফিসে বেরোবার মুখে প্রফুল্ল উমাকে ভরসা দিয়ে যায়, 'তুই ভাবিসনে উমা। ছোঁড়াটা আবার যদি কোন অভদ্রতা করে আমি এবার নিশ্চয় পুলিসে খবর দেব।'

উমা ভাইপোকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ঘাড় নাড়ে, কথা বলে না।

প্রফুল্ল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানে ব'সে হামিদ আবার শিস দিয়ে গান জুড়ে দেয়। জানলাটা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। তা যাক্ কিন্তু কান তো আর বন্ধ করতে পারবে না।

আশ্চর্য, এতদিন ধ'রে এত চেষ্টা করছে হামিদ কিন্তু মেয়েটার মন মোটে টলে না। অবশ্য পয়সা ব্যয় করলে পাড়ায় মেয়ের অভাব নেই। ঐ বয়সী যথেষ্ট মেয়েই আছে। কিন্তু ঐ রকম মুখ, ঐ রকম চোখের দৃষ্টি যে আর কারোরই নেই। এমন রূপ এমন চেহারা থাকা সত্বেও এত বেরসিক কেন মেয়েটা? তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ক্রুদ্ধ বিরক্ত মুখে সশব্দে জানলাটা বন্ধ ক'রে দেয়। ঐ মুখে কি

বিরক্তি মানায়! মানায় ঐ চোখে অমন কড়া শাসনের ভঙ্গি। মোলায়েম ক'রে একটু হাসলে না জানি আরো কত সুন্দর দেখাতো মেয়েটিকে—ও নিজেও বোধহয় সে কথা জানে না।

ছোট্ট আরশিটুকু সামনে নিয়ে হামিদ তার বাবরি চুলগুলি বার বার ক'রে আঁচড়ায়, বিড়ির পাতা কাটা কাঁচিটা দিয়ে কচি গোঁফের বাড়ন্ত রোমগুলি ছেঁটে ছেঁটে দেয়। দেখা যাক্ আরো দু-চারদিন। ভালোয় ভালোয় মেয়েটা যদি রাজী হয়ে যায় তো ভালো, না হ'লে একদিন জোর ক'রে খিল ভেঙে ঢুকবে গিয়ে ওর ঘরে। চেনে না তো হামিদকে! হামিদের উৎপাতের ভয়ে পারতপক্ষে এ ঘরেই আসে না উমা। ভিতরের দিকের ঘরগুলির সামনে যে লম্বা এক-ফালি বারান্দা আছে চিলতে চিলতে ক'রে বাড়িওয়ালা তা প্রত্যেক ভাড়াটেকে বাঁটোয়ারা ক'রে দিয়েছে। সেই দু' হাত আড়াই হাত জায়গায় তোলা উনুনে রান্না করতে হয়। উমাদের বারান্দা নেই। ঘরের সামনে সদর দরজার রাস্তা। ভুবনবাবু ঘরের ভাড়া নিয়মিত দিতে পারেন না। তার শাস্তি হিসাবে রান্নার জায়গার অর্ধাংশ প্রফুল্লদের দিতে হয়েছে। সকাল সন্ধ্যায় রান্নার সময়টা উমার সেখানেই কাটে। কোলের কাঁদুনে ছেলেটাকে নিয়ে বউদির কষ্ট হয়, অফিসের ভাত তাড়াতাড়ি ক'রে দিতে পারে না। তাই উমাই প্রায় রোজ আসে রাঁধতে। মাছের রান্না শেষ ক'রে উনুন লেপে নিজের জন্য আবার আলাদা ক'রে রেঁধে নিতে হয়।

শোয়ার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা হয়নি। বাড়িওয়ালার বুড়ো মা ছোট ছোট নাতিনাতনীদের নিয়ে দোতলার কোণের ঘরটায় থাকে। রাত্রে সেইখানে গিয়ে বিছানা পাতে উমা। বুড়ী বলে,

'তোর কোন ভয় নেই মা! আমার পাশে নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমো। কেউ তোর চুলের ডগাটুকুও ছুঁতে পারবে না।'

শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত তবু ঘুম আসতে চায় না উমার, বাড়িওয়ালা উঠে মাঝে মাঝে বাইরে যায়। আর তার চটি জুতোর শব্দে বুকের মধ্যে অকারণে উমার ঢিপ ঢিপ করতে থাকে, বার বার ঘুম ভেঙে যায়। একেকবার মনে হয়, এর চেয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকাই ভালো ছিল। কিন্তু থাকবে কি ক'রে। সেখানে শাশুড়ী আর ভাসুর তাকে দু'চোখে দেখতে পারলেন না। তাতে ক্ষতি ছিল না। দেবরটি দু'চোখ ভরে দেখতে চাইল, তাতেই হোলো বিপত্তি।

সুলতা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঠাকুরঝি তোমার কিন্তু ভাই একটু বাড়াবাড়িও আছে; দুপুর বেলায় তো নিজেদের ঘরে এসে ঘুমোতে পার। ওর দিকে না তাকালেই হোলো; না শুনলেই ওর শিস দেওয়া গান।'

উমা চুপ করে থাকে, সুলতা তো জানে না কপাল যাদের পোড়া অত সহজে তারা ছাড়া পায় না। কেবল না শুনলে ও না তাকালেই হয় না, অন্যের তাকানো শুনানোর জবাবদিহিও দিতে হয়।

কিন্তু তবু সুলতা সেদিন জোর ক'রেই উমাকে ঘরে নিয়ে এল— 'তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি, সারাদিন তুমি এঘর ওঘর করতে পারবে না। থাকো আমার পাশে শুয়ে। কে তোমার কি করতে পারে আমি দেখি।' তার পর ঘরের জানালাটা খুলে দিল সুলতা। দিন রাত জানালা বন্ধ রাখতে রাখতে ভিতরটায় ভ্যাপসা গন্ধ হয়ে গেছে।

সুলতা ছেলে কোলে নিয়ে অঘোরে ঘুমোয় কিন্তু উমার ঘুম পায়

না সে যে এ-ঘরে এসেছে কি ক'রে টের পেয়ে গেছে ছোঁড়াটা। শিস্ দিয়ে আবার গান ধরেছে। উমা উঠে জানলাটা বন্ধ করতে গেল। হামিদ বোধহয় এইই চেয়েছিল। উমা যেই জানলার ধারে এলো হামিদ এক বাক্স সাবান আর তরল আলতা উঁচু ক'রে তাকে তুলে দেখাল। হামিদ কিছুদিন ধরে জিনিসগুলি কিনে রেখেছিল। আলতা সাবানের লোভ কোনো মেয়ে সম্বরণ করতে পারে না। কিন্তু উমা যখন তার পরেও সশব্দে আগের মতই জানলা বন্ধ ক'রে দিল, হামিদের মনে হোলো—তার হৃদপিণ্ডটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। এমন নিষ্ঠুর এই মেয়ে জাতটা? ওদের কেবল ওপরটাই নরম, ভিতরটা শক্ত পাথর ছাড়া কি কিছু নয়?

প্রফুল্ল বাড়ি এসে সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। আর তো চুপ ক'রে থাকা চলে না, বাড়ি এবার বদলাতেই হোলো। কিন্তু বদলাবার চেষ্টা কি আর সে করে না? ক'রলে হবে কি? কারোর মুখে এমন কথা শোনা যায় না যে অমুক জায়গায় আছে ঘর একখানা। কিন্তু বাড়ি বদলাতে পারুক আর না পারুক ছোঁড়াটাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার দরকার। দিনের পর দিন ও যে ক্রমেই প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও প্রফুল্ল খুব ভেবে দেখেছে। এই নিয়ে হৈ চৈ হাঙ্গামা ক'রে লাভ নেই। পাড়া ভ'রে গুণ্ডা আর বদমাসের আড্ডা। তাছাড়া এ বাড়ির লোকের প্রকৃতিও সে জানে। সাহস ক'রে কেউ হামিদের গায়ে হাত দেয় না। সামনে লোক দেখানো একটু ধমকটমক হয়তো দেবে কিন্তু আড়ালে গিয়ে মুচকি হাসবে আর বলবে, 'এক হাতে কি আর তালি বাজে মশাই!"

কিন্তু আজ আর প্রফুল্লর সহ্য হোলো না। হামিদের বিড়ির

দোকানের সামনে গিয়ে বলল, 'হারামজাদা বদমাস! তোমাকে আমি পুলিসে দেব—তবে ছাড়ব।'

হামিদ মনে মনে হাসল। রোজ দেখে দেখে লোকটিকে সে চিনেছে। সকাল বেলায় উর্ধশ্বাসে দৌড়ায়, সন্ধ্যায় গড়াতে গড়াতে আসে কখনো কোনো দিকে তাকায় না, সকালে থাকে না সময়, সন্ধ্যায় থাকে না সামর্থ্য।

হামিদ নিতান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, 'মাথা গরম করেন কেন বাবু। আমি তো কেবল বিড়ি বাঁধি আর বেচি। পুলিস কেন আসবে এখানে। যদি আসে তো বিড়ির লোভেই আসবে। ভারি মিঠে কড়া বিড়ি আমার। আপনি তো কোনদিন খেয়ে দেখলেন না।'

কথাটা কেবল পরিহাস করেই যে হামিদ বলে তা নয়। মাঝে মাঝে ভারি সাধ যায় প্রফুল্লকে তার নিজের হাতে বাঁধা বিড়ি খাওয়াতে। শত্রু হলেও প্রফুল্ল তো মেয়েটিরই দাদা।

'আচ্ছা, তোমার ছ্যাবলামি আমি বের করছি দাঁড়াও!' দাঁত কিড়মিড় করতে করতে প্রফুল্ল ফিরে আসে।

জানালায় দেখা না পেলেও পথে মাঝে মাঝে উমাকে হামিদ দেখতে পায়। তার দোকানের সামনে দিয়েই একটা বুড়ীর সঙ্গে উমা কোন কোন দিন নাইতে যায় গঙ্গায় ফেরবার পথে তার সুন্দর ছোট কপালে শ্বেতচন্দনের ছাপ দেখে হামিদ মনে মনে ভাবে, মুসলমান বিড়িওয়ালা না হয়ে গঙ্গার ঘাটের ঠাকুর হয়ে জন্মালে আর কিছু না হোক ঐ কপালে নিজের হাতে সে চন্দনের তিলক তো পরিয়ে দিতে পারত।

হঠাৎ সেদিন তার চোখে পড়ল মেয়েটির পরনের কাপড়খানা শতছিন্ন। গিঁট ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। যে কাপড়খানা পুঁটলির মত হাতে ক'রে নিচ্ছে সেখানারও একই দশা।

পরের কয়েকদিন মেয়েটিকে আর গঙ্গায় যেতে দেখা গেল না। হামিদ সব বুঝতে পারল। কাপড় নেই শহরে একথা অনেককেই বলাবলি করতে শুনেছে কিন্তু আজ এই প্রথম যেন সে স্বচক্ষে তা দেখতে পেল। না থাকবার বেদনাটা এই প্রথম বিঁধল হৃদয়ে। ছিছি, কেন মিছামিছি আলতা আর সাবান সে কিনেছিল। কাপড়ের কথাটা কেন তার মনে হয়নি, কেন চোখে পড়েনি।

পরদিন কি একটা কাজে জানলার কাছে আসতেই উমা আর সুলতার চোখে পড়ল, হামিদ একখানা লাল ডুরে শাড়ি তাদের উঁচু ক'রে তুলে দেখাচ্ছে আর মিষ্টি মিষ্টি হাসছে।

সুলতা বলল, 'আহাহা, দিচ্ছে যখন হাত পেতে নাওই না ঠাকুরঝি।'

উমা কঠিন ভঙ্গিতে বলল, 'বউদি ইতরতার কি সীমা নেই তোমার? তারপর উমা জানালাটা ফের বন্ধ ক'রে দিল।

বাসায় এসে খবরটা শুনে প্রফুল্ল কিন্তু আজ আর তেমন চটল না, বলল, 'বোধ হয় চোরাবাজার থেকে কিনেছে, এখন চড়া দামে বিক্রি করতে চায়। আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি খোঁজ নিয়ে। যদি ধরা যায়, মন্দ কি।'

শাড়িখানি নিজের হাতে উমাকে পৌঁছে দিতে পারলেই সব চেয়ে আনন্দ হোতো হামিদের, কিন্তু তেমন সুবিধা তো শিগগির হবে না, মেয়েটা তাকে দেখলেই পালায়। দেওয়া যাক ওর দাদার

মারফতেই। বিনা পয়সায় দিতে পারলেই সব চেয়ে ভালো হোতো কিন্তু ইব্রাহিম সেখ ঐ শাড়িখানার জন্যে পুরোপুরি দশটা টাকা তার কাছ থেকে নিয়েছে। আজ বাদে কালকের হোটেল খরচটাও হামিদের কাছে আর নেই।

হামিদ বলল, 'দশ টাকা দিন বাবু, কেনা দামেই দিচ্ছি আপনাকে।

মনে মনে ভাবল, বিনা দামে যদি দিতে পারতাম। প্রফুল্ল তবু দর করে, 'দশ টাকা! মাথায় বাড়ি দিতে চাস নাকি তুই দেব একবার পুলিসে খবর!' অগত্যা ন'টাকায় রফা করতে হয়। বেচতে তাকে যে হবেই। লোকসানে না বেচলেই কি লোকসান সে ঠেকাতে পারবে!

কিন্তু পরদিন সবিস্ময়ে হামিদ দেখতে পেল, ডুরে শাড়িখানি উমা পরেনি। তার বউদিই সেখানা পরে ছেলে কোলে নিয়ে ঘর ভ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হামিদের মনে যে জ্বালা ধরল একশ টাকা লোকসানে তা হয় না। তলে তলে তাহলে এই শয়তানিই ছিল ওদের মনে। আচ্ছা হামিদও দেখে নিচ্ছে। তার পর থেকে হাসিতে দৃষ্টিতে অশ্লীল সুরের গানে হামিদের প্রণয় নিবেদন স্পষ্টতর হোল, উচ্চতর হোল এবং অবিশ্রাম গতিতে চলতে লাগল। দোকানের সামনে দিয়ে ফের ওকে একবার যেতে দেখলে হয়, হাত ধ'রে উমাকে সে টেনে আনবে ভিতরে। দেখবে কে তার কি করতে পারে।

সুলতার বাপের বাসা বেনেটোলায়। ষষ্ঠী পূজার দিন সকালবেলায় সুলতার ভাই নিতাই এল সবাইকে নিতে। 'চল দিদি।'

'এখনই! বলিস কিরে, তোর জামাইবাবু অফিসে যাবে না? রেঁধে বেড়ে দিতে হবেনা তাকে?'

উমা বলল, 'তাতে কি, তুমি যাও বউদি—আমি দেখব সব।'

নিতাই বলল, 'তাই বুঝি ভেবেছেন উমাদি। দেখবার জন্যে আপনাকে রেখে যাচ্ছি। চলুন চলুন চটপট তৈরী হয়ে নিন।'

সুলতা বলল, 'চল ঠাকুরঝি।'

প্রফুল্ল বলল, 'আমার জন্যে ভাবিসনে। একবেলা হোটেলে চালিয়ে নেব।'

নিতাই বলল, 'আহাহা কেন আবার মিছামিছি হোটেলে খরচ করতে যাবেন ওবেলা তো নেমন্তন্নেই যাচ্ছেন।'

কিন্তু নিতাই কি পাগল হয়েছে? উমার কি জো আছে যাওয়ার?

নিতাই বলল, 'কেন—কি হয়েছে উমাদি।'

'হবে আবার কি। শরীরটা ভাল নেই ভাই।'

প্রফুল্ল ও একটু যেন অসন্তুষ্টভাবে বলল, 'কেন কি হয়েছে তোর শরীরে?

তারপর উমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে পেরে প্রফুল্ল বলল, 'যাওতো নিতাই, দুটো সিগারেট নিয়ে এসো তো সামনের দোকান থেকে, এই নাও পয়সা।'

নিতাই বেরিয়ে গেলে প্রফুল্ল বলল, 'তুই আমার ধোয়া কাপড়খানা পরে যা, চুল পেড়ে কাপড়ে তো দোষ নেই।'

উমা ম্লান একটু হাসল, 'আর তুমি! তুমি বুঝি ঐ পা-জামা প'রে যাবে জামাই ষষ্ঠীতে!'

উমা ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নার আয়োজন করতে বসল এবং কারো ডাকাডাকিতেই আর ফিরল না।

সুলতা মনে মনে লজ্জিত হোলো, ক্ষুব্ধ হোল। কিন্তু শরীর

ভাল না থাকার অছিলায় সে তো আর না গিয়ে পারে না। কাপড় কি তারই আছে? আটপৌরের মধ্যে সেদিনের কেনা ঐ ডুরে শাড়িখানাই কেবল আস্ত। কিন্তু তা পরে তো আর বেরোন যায় না। বাপ মায়ে ভাববে, একবারেই ফকির হয়ে গেছে। বাক্স ঘেঁটে অবশেষে একখানা অত্যন্ত পুরোনো শাড়ি বেরোল। পরে যাওয়া যায়। কিন্তু অতি সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা প্রতিমুহূর্তে। সুলতার যাওয়ার খানিক পরেই খেয়ে দেয়ে প্রফুল্লও বেরিয়ে গেল অফিসে।

উমা চান ক'রে কেবল কাপড় বদলেছে—বাড়িওয়ালার মা বললেন, 'আহাহা নেয়ে উঠলি মা, পিণ্টুকে যদি নাইয়ে দিতিস একটু। ওর মা তো হাসপাতালে দিব্যি আছে, যত জ্বালা হয়েছে আমার।'

অপ্রসন্নতা চেপে উমা বলল, 'তাতে কি মা, পাঠিয়ে দিন—আমিই দিচ্ছি ওকে নাইয়ে।' কিন্তু পাঁচ ছ'বছরের ছেলে হলে কি হবে পিণ্টু একেবারে বদমাইসের হাঁড়ি। ওর মাথায় এক ঘটি জল ঢালতে না ঢালতেও সমস্ত বালতির জল দিল উমার গায়ে ছিটিয়ে। পিণ্টুকে নাওয়াতে গিয়ে উমা নিজেই আর একবার নেয়ে উঠল।

একখানা মাত্র কাপড় আছে শুকনো। সেদিনের সেই ডুরে শাড়িখানা। ঘরে এসে আলনা থেকে পেড়ে নিয়ে ভিজে কাপড় বদলে ফেলল উমা। কিন্তু এখানা প'রে সকলের সামনে গিয়ে খেতে বসতে লজ্জা করে। একটু দেরি করলেই আগের ভিজে কাপড়খানা শুকিয়ে যাবে।

সমস্ত ঘরটা অগোছালো। বাপের বাড়ি যাওয়ার আগে ছেলেকে সাজিয়েছে, নিজেকে সাজিয়েছে কিন্তু ঘরটা একটু সেরে-তেরে রেখে

যাওয়ার বউদির সময় হয়নি। কেন উমাই তো আছে। বলিহারি মানুষের আক্কেল! অপ্রসন্ন মুখে উমা ঘরটা ঝাঁট দিতে লাগল। তারপর স্থলতার প্রসাধন পর্বের শেষে যা সামান্য আবর্জনা জমেছিল ঘরে, সব জড়ো ক'রে জানলার একটা পাট খুলে দুটো শিকের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে সেগুলি ফেলে দিল রাস্তায়।

হামিদ যেন এতক্ষণ তাকে তাকে ছিল। উমার সাড়া পাওয়া মাত্রই বিড়ি বাঁধা বন্ধ রেখে দু'চোখ তুলে জানালার দিকে তাকাল। মুহূর্তকাল মুগ্ধভাবে তাকিয়েই রইল, তারপর প্রসন্নকণ্ঠে বলল 'হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে—চমৎকার মানিয়েছে এবার।'

উমা চমকে উঠে জানালা বন্ধ ক'রে সরে এল ওখান থেকে। লোকটা আরও কি ক'রে বসবে ঠিক কি। ভয়ে বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, হামিদ আজ আর শিস দিয়ে উঠল না, অশ্লীল সুরে গানও ধরল না, চুপ করেই রইল। তবু উমার দুই কান ভরে একটি মৃদু কণ্ঠ বারবার ধ্বনিত হতে লাগল: চমৎকার মানিয়েছে।

পাথরের চোখ

বছর তিনেক বয়সের সময় কি একটা খারাপ জ্বরে ডান পা খানা বীণার শুকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সমস্ত পৃথিবীটা শুকিয়ে গেল এই উনিশ বছর বয়সে এসে যখন পৃথিবীতে এতলোক থাকতে তার সম্বন্ধ এলো কাণা সরোজ সেহানবিশের সঙ্গে—কোন চক্ষুষ্মানের চোখে সে পড়ল না। অথচ শুকনো পার ক্ষতি আর সব দিক দিয়েই পূরণ'

ভাগ্যেছে বীণার। চোখ মুখের গড়ন তার নিখুঁৎ, সুন্দর সুগঠিত নাক, পাতলা দুটি ঠোঁট—আর কোন অঙ্গেই কোন একটু ত্রুটি বিচ্যুতি ধরবার জো নেই। আর শুধু বহিরঙ্গই নয়, মনের দিক থেকেও সাধারণ নিম্নবৃত্ত ঘরের মেয়ের পক্ষে যা সম্ভব তার থেকে বেশীই বীণা নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এক পা না থাকায় স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বাড়িতেই ভাইবোনদের বই পত্র নিয়ে নিজের গরজে লেখাপড়া শিখেছে, পাশের বাড়ির রেকর্ড শুনে শুনে শিখেছে গান, সেলাই আর ঘরকন্নার কাজে অল্প বয়সেই হাত পাকিয়েছে, তবু কোন সুস্থ সম্পূর্ণ মানুষের মনের মত সে হতে পারল না। তার চেয়ে বিদ্যায় বুদ্ধিতে, কাজকর্মে সব দিক থেকে হীন হয়েও পাড়ার লীলা, বেলা, সীতা' চিনু সবারই যোগ্য বরে বিয়ে হয়ে গেল, এমন কি নিজের ছোট বোন মীনার বিয়ে পর্যন্ত আটকালো না। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের অপছন্দের বস্তু হয়ে রইল কেবল বীণা—কেউ তাকে ভালবাসল না, কারোরই তাকে ভালো লাগল না।

অবশ্য ভালো যে কারোরই এক আধটু একেবারে লাগেনি তা নয়। কিন্তু সে ভালোলাগা দিয়ে কি করবে বীণা কোন্ কাজে লাগাবে কৃপণ মানুষের এই হিসাব করা ভালো লা[illegible]কে। এর চেয়ে ওদের ঘৃণা ছিল ভালো, অবজ্ঞা ছিল ভালো কিন্তু এই হিসাবী ভালবাসা বীণা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

পাশের বাড়ির অতুল ডাক্তারের মেয়ে বেলাকে বিয়ে করেছে পরেশ। কলকাতায় চাকরি করে। ছুটিছাটায় প্রায়ই আসে এই মফঃস্বল সহরের শ্বশুর বাড়ীতে। কিন্তু বিয়ের আগে যেমন থাকত তেমনি এখনও এখানে এলে বেশির ভাগ সময় কাটায় বীণাদের

বাড়ীতে। বীণার সঙ্গে তার কথা বলতে, আলাপ করতে নাকি ভারি ভালো লাগে। পরেশ প্রায়ই বলে, 'এত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হোল কিন্তু এমন চমৎকার কথা আর কারো মুখেই শুনলাম না। বীণা অদ্ভুত একটু হাসে, 'চমৎকার কথা বলতে আপনিই বুঝি কম ওস্তাদ।'

বীণার কথার চমৎকারিত্ব পরেশ বিয়ের আগে থেকেই জানে তবু সে বিয়ে ক'রছে অতুল ডাক্তারের মেয়ে বেলাকে। কথা তার বীণার মত চৎকার নয়, কিন্তু দু'খানা পা মেলে চমৎকার সে চলে। বলবার মত অমন চলবার শক্তিও যদি বীণার থাকত—তাহ'লে কি আর কোন ইতস্ততঃ করত পরেশ। কিন্তু খোঁড়া মেয়েকে ভালোবাসলেও বিয়ে করবার সময় একটু দ্বিধা আসে বইকি। পা থাকতেও তো এদেশের মেয়েরা খোঁড়া। সারাজীবন ঘাড়ে করে তাদের বয়ে বেড়াতে হয়, তারপর সাধ ক'রে আবার পা না-থাকা খোঁড়াকে জীবনসঙ্গিনী করা! সে কথা ভাবতেও ভয় হয়।

চিন্ময়ীর বর পরিতোষও বীণাকে কম ভালবাসে না। বউয়ের চিঠির মধ্যে দ্ব্যর্থ চৌরপঞ্চাশিকা এখনো সে মাঝে মাঝে বীণাকে পাঠিয়ে থাকে। অপরাধের মধ্যে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর দু'চারি লাইনে বন্ধুর বরকে বীণা দু' একখানা চিঠি দিয়েছে। তার বদলে দু'চার হাজার লাইনও কি পরিতোষ লেখেনি। কত মেয়ের কত রকমের হাত আর হাতের লেখা দেখেছে পরিতোষ কিন্তু বীণার মত এমন রসভরা হস্তাক্ষর আর কোথাও চোখে পড়েনি। অদ্ভুত ক্ষমতা বীণার। রস-সিন্ধুকে সে অক্ষয় অক্ষর সিন্দুকে বন্দী ক'রে রেখেছে। এমন নিপুণ কথা শিল্পী সে। কিন্তু দুঃখ পরিতোষের এই কৃপণ

বীণা কেবল দু'চার ছত্র চিঠি পত্রের মধ্যেই তার নৈপুণ্যকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখল, বন্যার মত সব কিছুকে ভাসিয়ে নিতে দিল না।

এখন পর্যন্ত অবিবাহিত আরো দু'একজন তাকে ভালোবাসে। কলেজের তরুণ অধ্যাপক তারক সোমের সঙ্গে তাদের দূর সম্পর্কের কি একটু আত্মীয়তা আছে। মাঝে মাঝে সেই সুবাদে তিনি আসেন। এসেই বীণার গান শুনতে চান। এমন কণ্ঠ তিনি আর কোথাও শোনেন নি। আর একটু চর্চা করলে বীণা রেকর্ডে রেডিয়োতে নিশ্চয় গান দিতে পারবে একথাও শোনান। তবু গান আজকাল বীণা তার সামনে কদাচিৎ গায়। কেননা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হরগোবিন্দ চাকলাদারের ছোট মেয়ে বি, এ, ক্লাসের ছাত্রী পরিমিতার সঙ্গে তারকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হ'তে যাচ্ছে। পরিমিতা অবশ্য গান গাইতে জানেনা, কিন্তু কলেজের মধ্যে সব চেয়ে বিদুষী মেয়ে। তার চৎমকার দুটি পা, সহরের মধ্যে হাই-হীল জুতো এমন আর কারো পায়ে মানায় না। সখ ক'রে যে দিন আলতা পরে সেদিনও তাকে অপূর্ব দেখায়। ভাগ্যক্রমে বীণা জুতোও পরতে পারেনা, আলতাও পরতে পারেনা, হাঁটু থেকে ডান পায়ের পাতা পর্যন্ত বেঁকে চুরে শুকিয়ে এমনি চামসে হয়ে গেছে।

কলেজের তরুণতর ছাত্রদের মধ্যে গুণগ্রাহী আরো একাধিক আছে। বীণাদের বাড়ীর সামনের লাল সুরকী-ছাওয়া রাস্তায় খাতাপত্র হাতে তারা যখন যাতায়াত করে, তখন জানালার শিকের ফাঁকে বীণার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার ইচ্ছা অনেকের মুখেই ফুটে উঠে। কেউ বা বোনকে পাঠায়, কেউ বা বউদিকে; বীণার হাতের টেবিল ঢাকনি না হলে সাহিত্য সভার টেবিল ঢাকে না।

তবু বীণার সম্বন্ধ এলো সরোজ সেহানবিশের সঙ্গে একটি চোখ যার নেই। কিন্তু তা ছাড়া আর সবই আছে। মা বাপ ভাই বোন আছে, সহরের দক্ষিণপ্রান্তে খোলা জায়গায় আছে পাকা একতলা বাড়ী, আদালতে আছে পাকা পেশকারি চাকরি, মাইনের তিন চারগুণ উপরি আছে—আর কি চায় বীণা, আর কি সে চাইতে পারে।

কিন্তু বীণা তবু মুখ ভার ক'রে বলল, 'আমার বিয়ের দরকার নেই মা'।

কথাটা মার মুখ থেকে যথারীতি গেল বাবার কাণে। নীলরতনবাবু ধমকে উঠলেন, 'তা থাকবে কেন? চিরকাল এমন ইয়াকি ফাজলেমী করেই দিন কাটাবি ভেবেছিস, না?' কনকতারা ইঙ্গিতে স্বামীকে থামিয়ে দিলেন, 'আহাহা তুমি থামো, যা বলবার আমি বুঝিয়ে বলব। সোমত্ত মেয়ে অমন ক'রে বলতে লজ্জা করে না তোমার?'

মেয়েকে বললেন, 'অমন করছিস কেন মা। এমন ভাগ্য তো নিখুঁৎ সুন্দরী মেয়েরও হয় না। এমন ভদ্র শান্ত চরিত্রবান ছেলে। দোষের মধ্যে একটা চোখ কেবল নেই। মানুষের চোখছাড়া কি আর কিছু তোর চোখে পড়ল না।'

বীণা নতমুখে বলল, 'আর কিছু চাই না মা, শুধু দুটো চোখ যেন তার থাকে।'

কনকতারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, এর বছরখানেক আগে একজন বোবার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এসেছিল। অন্যান্য দিক থেকে সেও ছিল সুপাত্র।

কিন্তু বীণার এক কথা, মানুষের মুখে কথা না শুনে কি ক'রে থাকবে।

আজ কথাওয়ালা ছেলে যখন মিলল তখন তার চোখে বেজেছে চক্ষুহীনতা। এখন খোঁড়া মেয়ের জন্য সর্বাঙ্গ সুন্দর পাত্র কোথায় মিলবে। তারপর অগাধ টাকা পয়সা থাকত, সে এক কথা।

নীলরতন শক্ত মানুষ। বীণার 'না' শুনলে তাঁর চলে না, এমন সম্বন্ধ হাত ছাড়া হ'লে মিলবে না। লোকে বলে মাথায় একটু ছিট আছে সরোজের। তেমন একটু ছিট থেকে ভালোই হয়েছে, না হ'লে কেবলমাত্র এক চোখ না থাকার জন্য এক পা না থাকা মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায়। এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া ক'রে কি শেষে পস্তাবেন নীলরতন। তা ছাড়া মেয়ের কেবল এক পা নেই তাই তো নয়, আরো অনেক কিছু তার আছে। আছে চমৎকার চোখ মুখ, চমৎকার কথাবার্তা বলবার কায়দা, তাতে দু'পা ওয়ালা মানুষকে অনায়াসে কাছে টানতে পারে। কিন্তু বোকা, সংসার সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞা মেয়ে, ওকি বুঝবে, মানুষকে শুধু কাছে টানতে পারলেই হয় না, তাকে ধ'রে রাখবার ক্ষমতাও থাকা চাই।

তাই কারো আপত্তিই টিকল না। শেষ পর্যন্ত সরোজের সঙ্গে বীণার বিয়ে হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময় বীণা মোটেই বরের দিকে তাকাল না। কি হবে দেখে। বাঁচোখ যে তার বরের এ তো সে জানেই। কিন্তু আশ্চর্য সরোজের মুখে কোন অপ্রসন্নতার ছাপ নেই। এমন কি বীণা যে তাকে পছন্দ করেনি সে কথা জেনেও তার মনে কোন বৈলক্ষণ্য এসেছে তা বোঝা গেলনা।

বাসরঘরে শালী শালাজ সম্পর্কীয়াদের পরিহাসের সে দিব্যি চটপট জবাব দিল। কিছুতেই তাকে অপ্রতিভ বা অপ্রসন্ন দেখাল না। বীণা মনে মনে একটু অবাক হোল।

পাতা মুড়িবেন না।

বাসরের ভিড় ভাঙলে বীণা ভালো ক'রে স্বামীর চোখের দিকে তাকাল। বাঁ চোখটি তার পাথরের সত্যিই, সে চোখে পলক পড়ছে না।

সরোজ তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'কি দেখছ? আমার পাথরের চোখটা বুঝি?'

বীণা অপ্রতিভ হয়ে চোখ নামাল।

সরোজ বলল, 'শুনলুম একটা চোখ নেই ব'লে আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি।'

বীণা কোন জবাব দিল না।

সরোজ বলল, 'অথচ একখানা পা নেই ব'লেই তোমাকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে তোমার অপছন্দকেও আমি গ্রাহ্য করিনি।'

একখানা পা না থাকার কথাটা এবং ব্যথাটা বীণার যেন নতুন ক'রে মনে পড়ল। নিজের খুঁতের কথা এতক্ষণ সে ভুলেই ছিল। কিন্তু সরোজের কথার ভঙ্গিতে তার ব্যথা ছাপিয়ে বিস্ময়ই বড় হয়ে উঠল। কৌতূহলী কণ্ঠে বীণা বলল, 'আমার খুঁতের জন্যই আমাকে পছন্দ ক'রেছ! তার মানে!'

সরোজ এবারো তেমনি অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল, 'মানে অত্যন্ত সোজা। এক চোখে দু'পাওয়ালা বৌকে কতদিন আর পাহারা দিয়ে রাখতে পারতাম!'

সরোজের হাসির ভঙ্গিতে বীণা যেন শিউরে উঠল। তারপর আহত চোখে আবার তাকাল স্বামীর মুখের দিকে।

সরোজ বলল, 'বারবার অমন ক'রে কি দেখছ বলতো, পাথরের চোখ দেখে দেখে আর সাধ মেটে না?'

বীণা ম্লান একটু হাসল, 'পাথরের চোখই দেখব কেন শুধু।'

'তবে আর কি।'

'তার ভিতর দিয়ে পাথরের হৃদয়ও তো চোখে পড়ছে।'

সরোজ একটু যেন থমকে গেল। তারপর একখানা হাত বাড়িয়ে, বীণার হাতখানা মুঠোর ভিতর নিয়ে বলল, 'তা'হলে তার ভয় নেই। এবার দু'ফোটা চোখের জল পড়লেই হৃদয়ের পাথর গলে পড়বে। এতো আর চোখের পাথর নয়।'

স্ফুলিঙ্গ

নতুন রাস্ত[illegible]র কোল ঘেঁষে খানিকটা ফাঁকা জায়গা বেরিয়েছে। দিনের বেলায় হিন্দুস্থানী কয়েকটী ঘুঁটেওয়ালী এখানটায় গোবর ছড়িয়ে যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে সেই গোবরেই আবার পদ্মফুল ফুটতে [illegible]। ফাঁকা [illegible]গাটুকুর পিছনে রূপ-জীবিনীদের একটি ছোট- [illegible] একটির পর একটি তারাই এসে দাঁড়ায় এখানে। [illegible] দিন মনে হয় দাবার ছকে যেন [illegible]

রং-[illegible]

শরৎ যে [illegible] [illegible]য়, মা[illegible] পাঁচ সাত দিন কাছেও আসে। তখন কে[illegible] [illegible]র ফুলের মত মনে হয় না। ঘুঁটীগুলির রঙের ঔজ্জ্বল্যও ম্লা[illegible] [illegible]ন্তু তাই ব'লে ফিরেও শরৎ চলে যেতে পারে না। অনে[illegible] [illegible], এর মধ্যেই একটু বিচার-বাছাই ক'রে নেয়, কোন কে[illegible] [illegible]রুচি পাওয়া যায়। টিকোলো নাক, টানা টানা চোখও [illegible] [illegible]। জোটে তা নয়।

আজও শরৎ এমনি ভাবেই বাছাই ক'রে চলছিল। পছন্দ আর হয় না; তার নির্বাচনের ভঙ্গি দেখে মুখগুলি অবশ্য নীরব হয়ে নেই। শ্লেষ আর কটূক্তিতে শরতের কান দুটি ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

'কাণ্ড দেখ মিন্‌ষের, চোখ দিয়ে দেখছে তো না যেন চেটে নিচ্ছে।'

'হাতে আঙুল নেই তোদের? ঢুকিয়ে দিতে পারিসনে চোখের মধ্যে? জন্মের শোধ হয়ে যায় দেখা!'

কথাগুলি কানে ঠিক মধু বর্ষণ করে না কিন্তু চোখের তৃপ্তির জন্য কান না হয় খানিকটা কষ্ট স্বীকারই করল। এক সঙ্গে সর্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি কি সকলের ভাগ্যে ঘটে?

একেবারে কোণের দিকে লাইট পোষ্টের গা ঘেঁসে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণে শরতের তাকে চোখে পড়ল। বয়েস আঠের উনিশের বেশি হবে না। মুখটি বেশ কচি কচিই মনে হচ্ছে। এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা যে মুখে কোন জ্বলন্ত বিড়ি দেখা যাচ্ছে না।

শরৎ খুব কাছে এগিয়ে আসতেই মেয়েটি হঠাৎ যেন চমকে গিয়ে একেবারে আঁৎকে উঠল, তারপর আবার ঠিক হয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটির এমন আকস্মিক ভয় দেখে শরতেরও বিস্ময় কম হয় নি। একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বলল 'কি খুব চেনা চেনা লাগছিল বুঝি।'

রাধার বুকের ভিতরটা তখনও কাঁপছে। আস্তে আস্তে বলল, 'ও কিছু না। আসবেন?'

রাধাকে শরতের পছন্দ হয়েছে। মুখখানি শুধু কচিই নয়, সুন্দরও। রূপ যাদের উপজীবিকা—সৌন্দর্য তাদের মধ্যে কদাচিৎ মেলে। রাধাকে সেই ব্যতিক্রমের মধ্যেই ফেলতে হয়।

তিনটে টাকা শরতের কাছে একটু দুর্মূল্যই মনে হোল। কিন্তু এ মুখের জন্য একটা টাকা বেশী দেওয়া চলে। মেয়েটির পিছনে পিছনে শরৎ এগিয়ে গেল।

পুরণো দোতলা বাড়ী, কবুতরের খোপের মত ছোট ছোট পনর ষোলটি ঘর। এর অনেক ঘরেই শরৎ এসেছে। আঁচলের চাবি দিয়ে একতলায় সবচেয়ে দক্ষিণ দিকের যে ঘরটির তালা খুলছে রাধা, শরতের মনে পড়ল মাস কয়েক আগে এখানেও সে ঢুকেছিল। তখন অবশ্য যে মেয়েটির পিছনে সে দাঁড়িয়েছিল সে এর চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী এবং চতুর্গুণ মোটা। তার তুলনায় এতো অপ্সরী।

রাধা দোর খুলে নিজে আগে ঘরে ঢুকলো তারপর শরতের দিকে চেয়ে বলল, 'আসুন।' শরৎ ঘরে এলে হারিকেনের আলোটা আর একটু উসকিয়ে দিল রাধা।

বাজে কাঠের পুরোণ একটা তক্তপোষ, তার ওপর পরিপাটি করে পাতা বিছানা!

সেদিকটায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "বসুন না।'

শরৎ বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তক্তপোষটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল।

শরৎ সশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল; 'ভেঙে পড়বে নাকি ?'

রাধা খিল খিল করে হেসে উঠল, 'না, না, প্রথম দিন থেকেই রোজ অমন শব্দ হয়। কিন্তু ভেঙে কোন দিন পড়ে না, ভয় নেই।'

ফের হাসতে গিয়ে শরতের মুখের দিকে চেয়ে রাধা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

আশ্বস্ত হয়ে শরৎ আবার বসল। মেয়েটি বোধ হয় খুব বেশী

দিন আসেনি।’ গলার স্বর এখনো তার কর্কশ নয়, হাসির ধ্বনিটি এখনো বেশ মিষ্টি। শরৎ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার, অমন লুকিয়ে লুকিয়ে কি দেখছ মুখের দিকে চেয়ে। ফের সেই চেনা লোকের মুখ মনে পড়ছে নাকি? কার মুখের মত মনে হচ্ছে?’

রাধার মুখ দিয়ে যেন হঠাৎ বেরিয়ে এল, ‘আমার মেজদার।’

শরৎ দম নিল। মেয়েটি তো ভারি বেরসিক। মনে হ’লেও ও কথা কি এখানে কেউ বলে? মেয়েটি খুব অল্প দিন এসেছে সন্দেহ নেই।

শরতের ভাবান্তর দেখে রাধা আবার মুখ নিচু করল।

প্রসঙ্গ বদলে শরৎ জিজ্ঞাসা করল, ‘নাম কি তোমার?’

রাধা নিজের নাম বলল।

‘কতদিন এসেছ কলকাতায়?’

‘মাস ছয়েক, তার মধ্যে তিন মাস তো মাখনের সঙ্গেই ছিলাম।’

শরৎ বলল, ‘মাখন কে?’

রাধা আর একবার চোখ নামাল, ‘আপনার কাছে বলতে লজ্জা হচ্ছে। তার সঙ্গেই তো প্রথম এলাম বাড়ী ছেড়ে।’

এই সব গল্প সম্বন্ধে শরতের আর কোন কৌতূহল নেই। সবাই প্রায় ঠিক একই রকম বলে। সকলেই প্রেমাস্পদের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালায় আর তারা শেষে পালায় এদের ছেড়ে! যে সব মেয়ের এই পাড়াতেই জন্ম তারাও ওধরণের গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলে। শুনে নবাগতের মন সরস এবং করুণ হয়ে ওঠে। নিজেকে মনে হয় তার সেই প্রথম প্রেমিকের মত। ওরাও ভাব বুঝে অনেকটা সেই ধরণের অভিনয় করে! এ সব গল্প শুনে শুনে শরতের অরুচি ধরে

গেছে। কিন্তু মেয়েটি ভারি চালাক। ওর বলবার ভঙ্গির মধ্যে নতুনত্ব আছে। এদের মধ্যে আর কোন মেয়ে শরৎকে কোনদিন এমন ক'রে জানায়নি যে তার পূর্বের প্রণয়-কাহিনী বলতে লজ্জা করছে। ভারি চতুর তো মেয়েটি। কিন্তু শোনাই যাক আরো কি বলে। শরৎ বলল, 'পালিয়ে কেন এলে, ভালোই যদি বেসেছিলে তাকে বিয়ে করলেই পারতে।'

রাধা বলল, 'এক জাত না হ'লে বিয়ে কি করে হয়?'

শরৎ বলল, 'কি জাত ছিল মাধবরা?'

'গয়লা ঘোষ।'

শরৎ হাসল, 'আর তোমরা?'

'আমরা কায়স্থ।'

একটু যেন গর্বের মত শোনাল। জাতি গৌরব রাধার যেন এখনো যায়নি।

শরৎ বলল, 'মাত্র এই জন্যই বিয়েটা আটকে রইল? কিন্তু এখন তো এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের বিয়ে মাঝে মাঝে হয়। পালিয়ে না এসে বললেই পারতে বাড়িতে।'

রাধা বলল, 'কাকে বলব, মেজদাকে? ওরে বাবা, ওকে তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না।'

'কেন গয়লা ঘোষ ব'লে?'

রাধা হাসি চেপে বলল, 'তিনি বলতেন লোকটা শয়তান। ওর মতলব ভালো নয়। তাছাড়া তার বউ ছেলে মেয়ে সব ছিল কিনা।'

'ও, তাহ'লে তো তিনি ঠিকই বলেছেন। তিনি তাহ'লে লোক চিনতেন।'

শরতের ভাবে মনে হোল যেন কৃতিত্বটা তারই।

রাধা বলল, 'তা চিনবেন না কেন? যেমন বুদ্ধিমান তেমনিই খাঁটি মানুষ তিনি! এমন লোক সহজে দেখা যায় না!'

শরৎ মনে মনে হাসল, খাঁটি সংসারে সবাই। দুনিয়ায় লোক চিনতে আর বাকি নেই শরতের।

এক হাত আর এক হাতের মধ্যে ধরে একটু পিছু হেলে গায়ের আড়মোড়া ভাঙল রাধা। চোখ বুজে হাই তুলল একবার।

এ সব লক্ষণ শরতের সুপরিচিত। কেউ বা স্পষ্ট মুখ ফুটেই টাকাটা চেয়ে নেয়, কেউবা একটু ইসারা-ইঙ্গিতে ভদ্রতা রাখতে ভালবাসে।

ব্যাগ থেকে তিনটে টাকা বার করল শরৎ। বলল, 'এই নাও, কথায় কথায় বোধ হয় দেরীই ক'রে ফেললাম তোমার। গল্প করতে করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। চমৎকার লাগছিল তোমার সঙ্গে গল্প করতে।'

রাধা মুখ ফিরিয়ে হাসল। ঢং দেখ লোকটার। আসলে ঘুঘু, কিন্তু দেখাচ্ছে যেন সাধু সন্ন্যাসী! আচ্ছা দেখে নিচ্ছে রাধাও। কিন্তু কিছুতেই আজ তেমন আর উৎসাহ আসছে না। শরীরে জুৎ নেই। আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারলেই ভালো হোত। দুটো খাকি-পরা শিখ কাল সমস্ত রাত জ্বালিয়ে মেরেছে। ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে চোখ মেলে চাইতে ইচ্ছা করছে না।

রাধা মুখ নিচু করে বলল 'কি যে বলেন। আমার ভারি লজ্জা করছে আপনার কথা শুনে।'

শরৎ অবাক হয়ে বলল, 'কেন, আমার কাছে লজ্জার কি হোল তোমার। বলোই না খুলে ব্যাপারটা কি।'

রাধা একবার শরতের মুখের দিকে তাকিয়ে ফের চোখ নিচু করল, 'দয়া করে অমন পীড়াপীড়ি করবেন না। আপনার জোর করবার ধরণটিও একেবারে ঠিক তাঁর মত। দায়ে পড়ে এই পথে এসেছি বলে কি আত্মীয় স্বজনের কথা সব একেবারে মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে!'

শরৎ আর একবার ধাক্কা খেল। বলে কি মেয়েটা। এখনো কি তার মেজদার সঙ্গে শরতের মুখের সাদৃশ্যটা মনে ক'রে রেখেছে না কি। ভালো জ্বালা। ভারি হাসি পেল শরতের। এ তো কেবল সাদৃশ্য। বন্ধু বিনোদের দুই বোন উমা আর রমাও তাকে পরিষ্কার দাদা বলে ডাকত। বিয়ের পর ফের আবার দাদা ডাকতে সুরু করেছে।

শরৎ একটু করুণ সুরে বলতে চেষ্টা করল, 'সে সব মনে ক'রে রেখে আর কি লাভ বলো। তোমার মেজদা তো এতদিনে নিশ্চয়ই সব শুনেছেন।'

রাধা বলল 'শুনেছেন বৈকি। এত দিনে কি শুনতে বাকী আছে?'

'কি ভাবছেন তিনি?'

'সে কথা কি ভাবা যায়!'

শরৎ হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, তিনি খুব ভালবাসতেন তোমাকে, না।'

'বাসতেন আবার না? বড়দা মারা গেলেন, ছোড়দা মারা গেলেন, সংসারে রইলাম কেবল আমি আর তিনি।'

শরৎ বলল, 'তাহ'লে এক কাজ করলে না কেন? ফিরে গেলে না কেন তার কাছে।'

'তাই কি আর হয়? এই পোড়ামুখ কি আর দেখান যায় তাকে।'

'আচ্ছা ধরো এখন যদি গিয়েই বসো কি করেন তিনি? তাড়িয়ে দেন?'

'তাড়িয়ে কি আর দেন? বাড়িতে যদি নাও রাখেন কোন একটা ভালো জায়গায় নিশ্চয়ই রাখবার ব্যবস্থা করেন। শুনেছি আশ্রম টাশ্রম নাকি আছে কত জায়গায়।'

শরৎ বলল, 'তাতো আছেই। যাবে তুমি কোন আশ্রমে?'

রাধা কৌতূহলী হয়ে বলল, 'তেমন কোন জায়গা জানা আছে আপনার? নেবে সেখানে আমাকে?'

শরৎ বলল, 'কেন নেবে না? আমি একটু ব'লে ক'য়ে দিলে নিশ্চয়ই নেবে।'

রাধা কাতরভাবে বল্‌ল, 'তাহ'লে দিন না একটু ব'লে ক'য়ে, আমার আর মন টেঁকে না এখানে। আর ভালো লাগে না এসব।'

শরৎ মনে মনে হাসল, ঈস্ একেবারে সতী-সাবিত্রী হয়ে পড়েছে দেখছি, একটু বাদেই তো গিয়ে আবার রাস্তায় দাঁড়াবে।

'কিন্তু সেখানে খুব সৎভাবে থাকতে হবে, একেবারে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মত। পারবে তো?'

রাধা বল্‌ল, 'কেন পারব না? গৃহস্থ ঘরের মেয়েই তো ছিলাম। কি করতে হবে সেখানে গিয়ে?'

আশ্রম যেন শরৎ একটি নিজেই খুলেছে, সর্বময় অধ্যক্ষ যেন সেই।

'কি আর করবে? পড়াশুনো আরম্ভ করবে, সেলাই শিখবে,

নানা হাতের কাজ শিখবে। কাপড় বুন্‌বে তাঁতে। তারপর যদি চাও ভালো দেখে বিয়ে-টিয়েও দেওয়া যেতে পারে!'

রাধা আরক্ত মুখে বলল, 'না না তার দরকার নেই। আপনি আমাকে কেবল সেই আশ্রমে ঢুকিয়ে দিন। কবে দেবেন বলুন।'

'যেদিন চাও, ইচ্ছা হ'লে কালই হ'তে পারে।'

'কালই? কাল আপনি আসবেন?'

'যদি বল আসব না কেন?'

রাধা বলল, 'না এলে চলবে কি করে? আপনি ছাড়া সঙ্গে ক'রে নিয়েই বা যাবে কে? কিন্তু সেখানে কি পরিচয় দেব।'

শরৎ হঠাৎ ভারি একটা রসিকতা ক'রে ফেলল, 'বলবে আমার মেজদার মুখের সঙ্গে এর মিল আছে।'

হাসতে হাসতে হঠাৎ শরৎ থেমে গেল, ভারি বোকার মত একটা কথা ব'লে ফেলেছে তো সে। রাধাও দেখা গেল মুখ নিচু ক'রে রয়েছে লজ্জায়। কথায় কি যায় আসে। তবু কোথায় যেন একটু বাধো-বাধো লাগে। এ সব জায়গায় এসে নানা রকমের রসিকতাই সে করেছে। কিন্তু এমন বোকামি এই প্রথম। এ ভাবকে তো প্রশ্রয় দিলে চলবে না। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সে আসেনি যে বেশ্যার সঙ্গে বোন পাতিয়ে সে বিদায় নেবে। বিশেষ ক'রে এমন খাসা একটি মেয়ে, টাকাও দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এর পর ফের আবার কি ক'রে আরম্ভ করা যায়। শরৎ ভাবতে লাগল, আলাপটিকে ফের সরস ধারায় বইয়ে দেওয়া যায় কি ক'রে। কিন্তু রাধার লজ্জা যেন আর ভাঙতে চায় না। সেই যে মেয়ে ঘাড় নুইয়েছে আর তুলতে

পারল না।" খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মালাটা এরই মধ্যে যেন শুকিয়ে এসেছে, হয় তো ফুলগুলি বাসি ছিল, হয় তো তেমন পয়সা দিয়ে কিনতে পারেনি। নুয়ে পড়া খোঁপার নীচে গ্রীবাটি বড় শীর্ণ। ও যে এত রোগা প্রথম দেখে তো তা মনে হয়নি।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দেখতে দেখতে শরৎ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সোজা চ'লে গেল দরজার দিকে। খুলল খিল। তারপর নতমুখী রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চললুম।'

রাধা যেন চমকে উঠল, একটু এল পিছনে পিছনে, বলল, 'আপনি রাগ ক'রে চললেন?'

শরৎ বলল, 'না-না, রাগ করব কেন।'

'আপনি এমন ক'রে চলে যাচ্ছেন, টাকা রাখতে লজ্জা করছে আমার।'

'আমার কাছে আর লজ্জা কি!'

রাধা সানুনয়ে বলল, 'কাল আসবেন, ঘর তো চেনাই রইল সোজা চ'লে আসবেন একেবারে। আসবেন তো?'

শরৎ বলল, 'আসব।'

রাধা বলল, 'আমি তাহ'লে তৈরী হ'য়ে থাকব?'

শরৎ বলল, 'থেকো।'

রাধা তাকে সদর দরজা পর্যন্ত সযত্নে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল, কিন্তু ঘরের দোর পর্যন্ত আসতে না আসতে পাশের ঘরের কুমুদিনী হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল তার গায়ে, 'জানালার পাল্লা খুলে আমি সব দেখেছি। মাগো, এত রঙ্গ জানিস তুই, মাত্র একবার তো সিনেমায় গিয়ে সখি সেজেছিলি, তাতেই এত সেয়ানা হয়ে গেছিস।'

রাধা ছদ্মকোপে বলল, 'সেয়ানা আবার কি লো। আমি কাল সত্যিই আশ্রমে চ'লে যাচ্ছি, দেখে নিস।'

কুমিদিনী বলল, 'যাস বাপু যাস, তোকে একদিন আশ্রমেই যেতে হবে। যে ভাবে খদ্দের ঠকাচ্ছিস তাতে তোর ব্যবসা বন্ধ হ'ল ব'লে। শরীর তো বাপু মাঝে মাঝে সকলেরই খারাপ হয়। সেদিন না বেরোলেই হোল। কিন্তু বেরোবিও, টাকাও নিবি, শেষে মেজদা ব'লে বিদায় করবি খদ্দের? দাঁড়া তোর জারি-জুরি আমি সব ভেঙ্গে দিচ্ছি।'

রাধা এবার সত্যি রাগ করল, মুখ বিকৃতি ক'রে বলল, 'দিস দিস, জানা আছে তোর ক্ষমতা।'

হয় তো রাগ করেই রাধা এ রাত্রে আর বেরোলো না। পরদিনও সন্ধ্যার পর সবাই যখন সেজেগুজে বেরুচ্ছে রাধা ঘরেই রইল। শরীরটা ভালো নেই।'

যাওয়ার সময় কুমুদিনী বলল, 'কি লো বেরোবি না।'

রাধা বলল, 'না লো না, আমার মদনমোহন আজ নিজেই আসবে। তার জন্য পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। ঘর সে চিনে গেছে।'

কুমুদিনী বলল, 'কালকের মেজদা আজ বুঝি মদনমোহন হ'ল?'

রাধা বলল, 'যাঃ, কি যে ইয়ার্কি দিস সব সময়, ভালো লাগে না।'

সে নিশ্চই আসবে। মুখ দেখে তো রীতিমত ঘুঘু ব'লে মনে হল ঠাট্টাটা সে নিশ্চয়ই হজম করবে না। আজ এসে হয়ত সুদে আসলে আদায় করবে।

করে যদি করুক। সত্যি এমন ভাবে ঠকানটা ভাল হয় নি। আর যদি যথার্থই সরল লোক হয় সে? সত্যিই আশ্রমে

নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে? তা হ'লে? হঠাৎ শ্বাস যেন রোধ হয়ে এল রাধার। তাহলে সে চলে যাবে এখান থেকে। এই পঙ্ক কুণ্ডের মায়া সে আর করবে না। আশ্রমের সেই সুন্দর পবিত্র জীবন, যেখানে গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মত সে থাকবে পড়বে, তাঁতে কাপড় বুনবে, তারপর—রাধার মুখ এবার সত্যি আরক্ত হয়ে ওঠে।

পাইস হোটেলে খাওয়া সেরে রাত ন'টায় শরৎ আবার সেই দাবার ছকের কাছে এসে পৌচেছে। কিন্তু কালকের মনোরম ঘুঁটিটি আজ আর নেই। হয়তো এতক্ষণে অন্য কোন খদ্দের পাকড়ে ঘরে ঢুকেছে। আচ্ছা ঠকিয়েছে কাল মেয়েটা। জীবনে আর এমন ঠকেনি শরৎ।

রাধার ঘর অবশ্য শরৎ চেনে। গিয়ে ঢুকলেই হয় সেখানে। ঘরে যদি আর কেউ থাকে সে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই চলবে।

কিন্তু গলির দিকে পা বাড়িয়েই হঠাৎ শরৎ থমকে দাঁড়াল। মেয়েটা যদি সত্যিই কালকের কথাগুলি বিশ্বাস ক'রে থাকে। যদি সত্যিই আশ্রমে যাওয়ার জন্য তৈরী হ'য়ে ব'সে থাকে রাধা? আজ তো আর শরৎ লোভ সামলাতে পারবে না। সাধুগিরি ক'দিন আর দেখান যায়। কিন্তু কাল তো সে পেরেছে। দেখাতে পেরেছে সে মহৎ, জিতেন্দ্রিয়। রাধা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ক'রেছে। সেই বিশ্বাসটুকু ভেঙে দরকার নেই। সেই স্মৃতিটুকু থাক রাধার মনে। টাকা ক'টি হয় তো কোন বাজে কাজে ব্যয় করবে না রাধা। সৎ লোকের দান ব'লে দীর্ঘকালের জন্য বাক্সে তুলে রাখবে। তারপর রোজ এই মাঠে দাঁড়িয়ে নিত্য নতুন আগন্তুকদের মধ্যে খুঁজবে একখানি মুখ, যার সঙ্গে তার মেজদার মুখের মিল আছে।

সৌরভ

সবদিক থেকে বিপদ একেবারে ঘিরে ধরেছে। একে তো জিনিস-পত্রের এই দুর্মূল্যের বাজার, তারপর দুটি ছেলে মেয়েরই একসঙ্গে টাইফয়েড, দেবব্রত অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল। কলেজের প্রফেসারী আজকাল মাষ্টারীর সমান। তারপর নতুন কলেজ। ধোপদুরস্ত জামা কাপড়ে, গলায় চাদর জড়িয়ে, একদল উজ্জ্বল জীবন্ত তরুণ তরুণীর সামনে বিদেশী কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা নিজের কাছেও বেশ উপভোগ্য মনে হয়; কিন্তু মাসের শেষে অধ্যাপনার দক্ষিণা বাবদ হাতে যা আসে তাতে সংসারের খরচ কুলোয়না। সকালে বিকালে টিউশানি দুটো তাই বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে। তার মধ্যে একটা থেকে নিয়মিত যা আদায় হয় তা এক কাপ চা আর কিছু মিষ্টি কথার সৌজন্য। কলেজ-কমিটির প্রেসিডেন্টের ছোট মেয়ে। প্রেসিডেন্ট নাকি খুব রক্ষণশীল। অন্যান্য সিনিয়ার এবং প্রৌঢ়বয়স্ক প্রোফেসরদের বাদ দিয়ে দেবব্রতকে যে তিনি নিয়েছেন এতেই তো তার ভাগ্য মনে করা উচিত। মাসে মাসে টাকাপয়সার তাগিদে বিপিনবাবু বিরক্ত হন। সেজন্য অত ভাবে কেন দেবব্রত। যখন যা দরকার বাড়ির ছেলের মতো নিঃসঙ্কোচে চেয়ে নিলেই তো পারে। একসঙ্গে সব টাকা দিতে হবে তার কি মানে আছে। এই তো গেল ছাত্রীর বাবার ধারণা। ছাত্রীর ধারণা আরো মারাত্মক। তার নিতান্ত সন্নিকটে সামনা সামনি ব'সে দেবব্রত যে তাকে পড়াতে পারছে এতেই তো তার কৃতার্থ হওয়া উচিত। তার বুদ্ধি সম্বন্ধে, পড়া-শুনোর ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে ক্ষীণতম কোন মন্তব্য করার আগে

দেবব্রত যেন ভুলে না যায় যে ডলি রায়ের বয়স আঠের ; পৃথিবীতে যে বয়স আর কোন মেয়ের কোন দিন হয়নি, হবেও না।

পরিচিত, স্বল্পপরিচিত সবরকমের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকেই ধার করতে দেবব্রত বাকি রাখেনি। পরিশোধের ভাবনা ভেবে মাথা খারাপ এখন না করলেও চলবে। আপাতত credit মানে কৃতিত্ব। যার কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, যে ভাবেই হোক সংগ্রহ করতে পারলেই দেবব্রত আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

দেবব্রতের চেয়ে কল্যাণী বরং অনেক শক্ত। মনে মনে ভয় পেলেও স্বামীর কাছ থেকে তা সে গোপন রাখতেই চেষ্টা করে। উল্টে সেই বরং ভরসা দিয়ে বলে, এত ঘাবড়াবার কী আছে, অসুখ বিসুখ কি হয় না ছেলেমেয়েদের ? আর এই বাজার দর কি তোমার একার জন্য চড়েছে ?

কিন্তু এই লোক-দেখানো নির্ভীকতা ভালো লাগে না দেবব্রতের। এতে সে আরো চটে যায়। হুঁ, ঘরে বসে অমন বীরত্ব সবাই দেখাতে পারে। বাইরে বেরিয়ে একবার পঁয়ত্রিশ টাকার জায়গায় ত্রিশ টাকা দরে দু'মণ চাল জোগাড়ের চেষ্টা ক'রে দেখ কতখানি মাথার ঘাম পায়ে ঝরে, কোন বন্ধুর কাছে দু'টাকা ধার চাইতে গেলে কতখানি বাগজাল বিস্তার করতে হয়।

কল্যাণীর অসন্তুষ্টি এবার কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে, 'ঘরে বসে মরচে পড়ে গেলুম তোমার জন্যই। না হ'লে আই-এর কোর্সটা তো শেষ ক'রেছিলাম, পরীক্ষটাই কেবল দেওয়া হয়ে উঠলনা। মনে আছে তোমাকে কত অনুরোধ ক'রেছিলাম ? তারপর কত মেয়ে বেরিয়ে গেল তোমার হাত দিয়ে, কেবল বড় ঘরামির চালায় শন উঠল না।

'হ্যাঁ, সেই advanced stage এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে এক ফ্যাসাদ ঘটিয়ে বসতে তাই বুঝি ভালো হোত ?'

বছর আটের আগেকার ঘটনা, তবু সেদিনের কথা স্মরণ ক'রে আজও সলজ্জে কল্যাণী মুখ নিচু করল। যেন সে ব্যাপারের সমস্ত লজ্জা কল্যাণীর একার।

সেই প্রথমদিনগুলির কথা কল্যাণীর মনে পড়ল। তাকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে তখনো দেবব্রতের দারুণ উৎসাহ। কিন্তু তার চেয়েও বেশি উৎসাহ প্রকাশ হয়ে পড়ত অন্য কাজে। কল্যাণী ছদ্মগাম্ভীর্যে একটু স'রে গিয়ে বলত, 'কী অসভ্য, ওসব কি হচ্ছে ?'

দেবব্রত প্রত্যুত্তরে, আবৃত্তি করত, 'পুরুষের সে অধৈর্য তাহারে গৌরব মানি আমি।'

আজো ভাবতে ভালো লাগে সেই দিনগুলির কথা। কথায় কথায় কবিতা, আর পদে পদে মিল। চিঠির পাতায় আর কবিতার খাতায় তখনকার অসংখ্য মুহূর্ত দেবব্রত ধরে রাখতে চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু সে সব উল্টে দেখবার সময় কই, তাছাড়া মিল দেওয়া কবিতা দেবব্রতের কানে আজকাল ভালগার লাগে।

দুখানা ছোট ছোট পায়রার খোপের নাম একটি ফ্লাট। আর তারই ভাড়া চল্লিশ টাকা। তা হলেও এর চেয়ে খারাপভাবে আর থাকা যায় না। শত হ'লেও শিক্ষিতা স্ত্রী এবং প্রেমজ বিবাহ। ভাববে কি। তা ছাড়া নিজেরও একটা পদমর্যাদা আছে তো সমাজে।

কিন্তু ছোট হোক বড় হোক সমাজই কি আছে এখানে ? অন্তত কোন স্পষ্ট ধারণা এ সম্বন্ধে দেবব্রতের নেই। কোন প্রতিবেশী নেই

এখানে ; এক. একটি ফ্লাট যেন এক একটি দ্বীপ। কোনটির সঙ্গে কোনটির যোগসূত্র নেই। এখানে কারো সঙ্গে তার আলাপ হয়নি, আলাপের কোন প্রয়োজনও সে বোধ করেনি। কিন্তু এখন, ছেলেদের এই অসুখের সময় আজ তার মনে হচ্ছে আলাপ ক'রে রাখলে বোধ হয় মন্দ হোতনা। তাহ'লে তার ছেলে মেয়ে যখন দুঃসহ ব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছে, তখন পাশের ফ্লাটে এই যে চব্বিশ ঘণ্টা রেডিও চলছে, অনুরোধ উপরোধে তার মধ্যে অন্তত দু'এক ঘণ্টা সে রেহাই পেতে পারত।

চারটে পর্যন্ত ক্লাস ছিল। কলেজ ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে এল দেবব্রত। ধরাচূড়া খুলতে খুলতে বলল, 'এসেছিলো ডাক্তার ?'

কল্যাণী বলল, 'হ্যাঁ।'

'কি বলল সুধীর ?'

'বললেন তো ভয় নেই।'

'ওতো ওদের বাঁধা বুলি। কতদিনের মধ্যে সেরে উঠবে তা কিছু বলল ? যত্ন ক'রে দেখে, না কেবল গল্পটল্প ক'রেই চলে যায় !'

'কি যে বল, শত হলেও তোমার বন্ধু তো।' কল্যাণী ক্লান্ত স্বরে বলল। দেবব্রত যেন বড় বেশি nervous, আর বড় বেশি বদ-মেজাজী হয়ে গেছে। কল্যাণী আর পেরে উঠছেনা। ছেলেদের শুশ্রূষাই করবে, না স্বামীকে সামলাবে। একটু চুপ ক'রে থেকে কল্যাণী বলল, 'যাও মুখ-হাত ধুয়ে এসো বাথ-রুম থেকে আমি ততক্ষণে তোমার চা ক'রে আনি। ওদের কাছে তোমার বসতে হবেনা, কিছুক্ষণ আগে ওদের পথ্য খাইয়েছি। এখন বেশ ঘুমোচ্ছে ওরা।'

চায়ে চুমুক দিয়ে দেবব্রত খানিকটা চাঙ্গা বোধ করল। কল্যাণীর

দিকে তাকিয়ে সত্যিই ভারি মায়া হোল তার। রাত জেগে জেগে কি চেহারাই হয়েছে। মুখে শুষ্ক শীর্ণতা, চোখের কোলে কালো ছায়া পড়েছে। সমস্ত শরীর ঘিরে ওর ক্লান্তির ছাপ। অনুতপ্ত কণ্ঠে দেবব্রত বলল,' সত্যি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার। স্বার্থপরের মত তোমাকে কেবল খাটিয়ে নিচ্ছি। তোমারও দোষ আছে। পালা ক'রে তো জাগবার কথা, আমাকে কেন ডেকে দাওনা সময়মত ?'

কল্যাণী একটু হাসল। তার ক্লান্ত ওষ্ঠাধরে ভারি ম্লান, ভারি করুণ দেখাল সে হাসি। কল্যাণী বলল, 'আর তুমিই বুঝি কম খাটছ, সারাদিন তো যায় ছুটোছুটিতে, তারপর রাত্রেও যদি এক-আধটু না ঘুমোতে পারো, শরীর টি`কবে কি ক'রে? আমার একটুও কষ্ট হয়না, তুমি ভেবনা।'

'না কষ্ট আর কিসের ? আজ সন্ধ্যার পরই খাওয়া-দাওয়া সেরে তুমি শুতে যাবে, আমি জাগব সারারাত। আজও আর ভাবছি যাবনা টিউশনিতে, মিছামিছি কি হবে গিয়ে, টাকা যখন আদায় হবেনা।'

কল্যাণী বলল, 'না না, দুদিন ধরে তো যাওই না, আজ দেখ যদি বলে কয়ে কিছু আদায় করতে পার। সব খুলে বললে এই অবস্থায় কিছু যাহোক অন্তত দেবেই। মানুষ তো। আর গেলেই আদায়ের কিছু সম্ভাবনা থাকে, অভিমান ক'রে বসে থাকলে তো আর ওরা দিয়ে যাবেনা, একবার দেখ চেষ্টা ক'রে, রাত-পোহাইলেই টাকার কত দরকার তা তো জানো।'

'তা আর জানিনে ? আচ্ছা।'

সন্ধ্যার পর বালিগঞ্জের একটা বাসে ভীড় ঠেলে অতি কষ্টে নিজেকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল দেবব্রত। অত ভীড় অত অসুবিধার মধ্যেও মাঝে মাঝে কল্যাণীর করুণ ক্লান্ত মুখচ্ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। তার স্নিগ্ধ প্রেমের মাধুর্য্যে জীবনের আদি অন্ত দেবব্রতের ছেয়ে গেছে। শুধু তার জন্যই সমস্ত দুঃখ-দৈন্য দুর্ভাবনাকে সে 'ট্রাজেডির' মত উপভোগ করতে পারছে।

'ষ্টপেজ' থেকে ডান হাতি একটা গলি ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলে তবে বিপিনবাবুর বাড়ি। কয়েকটি সুদৃশ্য মোটর বাড়ির দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে দেবব্রত বিস্মিত হোল। একদল স্ত্রী-পুরুষ বাড়ির মধ্যে ঢুকল, আর একদল বেরিয়ে এল। কি ব্যাপার। কোন উৎসব-অনুষ্ঠান আছে নাকি এ-বাড়িতে। নানা দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় দেবব্রতের যেন স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেছে, বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে যেন।

কিন্তু পরমুহূর্তে ডলিকে দেখা গেল। কয়েকটি সমবয়সী বন্ধুকে দোর পর্যন্ত সে এগিয়ে দিতে এসেছে। এই উৎসব উপলক্ষে চমৎকার ক'রে সেজেছে, উজ্জ্বল উল্লাস তার সর্বাঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে যেন। এ যেন অন্যান্য দিনের ডলি নয় যাকে সে নোট-মুখস্থ করিয়েছে, যার মূঢ়তায় মনে মনে সে হেসেছে। এ আর একজন, এ অসাধারণ।

মুহূর্তের জন্য দেবব্রতের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতে ডলি চোখ নামিয়ে নিল। তারপর বলল, 'বেশ মাষ্টার মশাই, আমার জন্মদিন, আর আপনি এই এলেন!'

মীরা ডলির কানে কানে বলল, 'ইনি তোর মাষ্টার মশাই নাকি, ডলি? তোকে হিংসা করতে ইচ্ছা হয় সত্যি।'

'কি যে বলিস।' ডলি সলজ্জে হাসলে।

দেবব্রতের মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে তার জন্মদিনের কথা ডলি বলেছিল বটে। কিন্তু আমন্ত্রণের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিল বলে তার মনে হয়নি। অসুখে ডাক্তারে আর বন্ধুদের কাছে ধার ক'রে ক'রে একথা তার একেবারেই মনে ছিলনা, আর মনে থাকলেই বা কি হোত। সে কি আসত নাকি!

বন্ধুদের বিদায় দিয়ে ডলি দেবব্রতকে বলল, 'আসুন, সবাই চলে গেল, আর আপনি এলেন। দেরি দেখে আমি তো ভাবলুম, আজও বুঝি এলেন না। দু'দিন ধরে তো আসাই বন্ধ করেছেন।'

দেবব্রত একটু হাসল, 'এ ক' দিন পড়াশুনা তো এমনিতেও হোত না তোমার।'

'বেশ; শুধু কি পড়াশুনোরই সম্পর্ক নাকি আপনার সঙ্গে?' বলতে বলতে ডলি নিজেই আরক্ত হয়ে উঠল।

কুমারীর নয়নে এই সলজ্জ আভাস দেবব্রত কি এই প্রথম দেখল জীবনে? নাহ'লে সে চোখ ফিরাতে পারছে না কেন?

একটু পরে বিপিনবাবুকেও দেখা গেল। 'এই যে, এতক্ষণ পরে দেবব্রত এসেছ। যাও ডলি, তোমার মাষ্টারমশাইকে নিয়ে যাও। দেরি করোনা আর, রাত হচ্ছে।'

ডলি দেবব্রতকে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। একটা নতুন টেবিল-ঢাকনি টেবিলের ওপর। ফুল-দানিতে রজনীগন্ধা। সামান্য এক-আধটু আসবাব-পত্রের অদল-বদলে ঘরখানিও যেন নতুন রূপ নিয়েছে।

ডলি বলল, 'আমার জন্মদিন আজ।'

দেবব্রত বলল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'কি মনে হচ্ছে ?' ডলি জিজ্ঞাসা করল।

দেবব্রত বলল, 'তোমার জন্মদিন।'

'এখানে এসে আপনার মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারি, একথা আপনার মোটেই মনে ছিলনা।'

'ওকথা বিশ্বাস করতে তোমার ইচ্ছা হয় ?'

'ইচ্ছা হয়না, কিন্তু কথাটা তো সত্যি। যদি মিথ্যাই হবে, বলুন তো কি এনেছেন আমার জন্যে ?'

মুহূর্তের জন্য দেবব্রত একটু বিব্রত বোধ করল, তারপর বলল, 'জানোতো, আমি যা দেব, তা আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে হয়না।'

'কি, কি দেবেন আপনি ?' ডলির স্বর একটু কেঁপে উঠল।

দেবব্রত একটু হাসল, পেনটা খুলে নিল পকেট থেকে, হাতড়ে হাতড়ে সাদা কাগজ আর বেরুলো না, বেরুলো একটা হলদে রঙের সিনেমার হ্যাণ্ডবিল, একপিঠে লেখা, কিন্তু আর এক পিঠের রঙ চমৎকার। নিজেরই একটা পুরোণ কবিতা অক্ষরের স্রোতে অনায়াসে নেমে এলো তার ওপর। কিন্তু এ যেন নতুন কবিতা লেখার আনন্দ।

সাদা ঝকঝকে চিনেমাটির প্লেটে প্লেটে এলো খাবার, এলো চা। সলজ্জ বিনয়ে টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে রইল ডলি। তার দিকে না তাকিয়েও তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ডলি বলল, 'কাল আসবেন তো ?'

দেবব্রত বলল, 'আসব।'

ডলি বলল, 'কিন্তু আপনি যে-দিনই আসবেন বলেন, সেদিন আর আসেন না। কাল আসবেন কিন্তু।'

দেবব্রত বলল, 'আচ্ছা।'

একটুর জন্য দেবব্রত শেষ ট্রামটা মিস করলনা, ছুটে এসে ধরতে হোল হ্যাণ্ডেল। শেষ ট্রামের যাত্রীরা যেন শেষের যাত্রী। শ্রান্তিতে শুষ্ক প্রত্যেকটি মুখ। কিন্তু অপূর্ব প্রসন্নতায় দেবব্রতের অন্তর পূর্ণ হয়ে গেছে। নিজেরই কবিতার লাইন গুণগুণ করছে তার মনের মধ্যে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে নিজেদের ফ্লাটবাড়িটার সামনেই ষ্টপেজ। ট্রামটা থামতেই নেমে পড়ল দেবব্রত। অনেক রাত হয়ে গেছে।

কাগজের ঢাকনি দেওয়া ম্লান আলোর নিচে তখনো কল্যাণী ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েদের শিয়রে বসে রয়েছে। দেবব্রত ঢুকতেই কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত হোল যে।'

'হুঁ, তুমি খেয়ে নাওনি বুঝি?'

কল্যাণী ম্লান একটু হাসল, তারপর বলল, 'টাকা আদায় হলো।'

'রাতদিন কেবল টাকা আর টাকা, তুমি কেমন যেন হয়ে গেছ আজকাল কল্যাণী।'

কল্যাণী ব্যথিত বিস্ময়ে স্বামীর দিকে তাকাল, 'আদায় হয়নি তাহ'লে? কিন্তু ভোর হ'লেই তো টাকার দরকার। দিলু আর মিণ্টুর ওষুধ-পত্র একেবারেই ফুরিয়ে গেছে।'

দেবব্রত বিরক্তি দমন ক'রে কোমলকণ্ঠে বলল, 'তুমি ভেবনা, কালই একটা ব্যবস্থা হবে।'

কল্যাণী একটু নিস্পৃহভাবে দূর থেকে বলল, 'হোলেই হোল।'

'হবে হবে, আমার কথা বিশ্বাস কর।'

খেতে বসল দুজনে পাশাপাশি। রোজ যেমন বসে। কল্যাণী দেবব্রতের থালার দিকে চেয়ে বলল, 'খাচ্ছনা যে? সবই যে পড়ে রইল।'

'এই তো খাচ্ছি, সবদিন কি সমান খাওয়া যায়? ক্ষুধা নেই তেমন।'

'ক্ষুধা নেই কেন, আর কিছু খেয়েছ নাকি কোথাও।'

এমন খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করার অভ্যাস কল্যাণীর! দেবব্রত এক ঝোঁকে বলল, 'হ্যাঁ, জলটল খেতে হোল কিছু, ডলির জন্মদিন ছিল!'

কল্যাণী একমুহূর্ত চুপ ক'রে রইল, তারপর হেসে বলতে গেল, 'তাই বল, পেটপুরে খেয়ে এসেছ, আর বলছিলে খিদে নেই।'

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগারেট শেষ ক'রে দেবব্রত বলল, 'যাও, তুমি শুয়ে পড়, কদিন ধরেই তোমার রাত-জাগা পড়ছে, চেহারা গেছে খারাপ হয়ে। আমিই আজ জাগি।'

কল্যাণী বলল, 'নানা তোমার এ সব অভ্যাস নেই, তুমি শোও গিয়ে।

দেবব্রত বলল, 'কিচ্ছু ভেবনা। আমি আজ খুব জাগতে পারব।'

স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে কল্যাণী চোখ ফিরিয়ে নিল।

দেবব্রত বুঝতে পারল একটা অহেতুক উল্লাস এই সমস্ত পরিবেশকে ছাপিয়ে উঠছে, যা তার নিজের কাছেই অত্যন্ত অশোভন লজ্জাকর বলে মনে হোলো। নিজের আচরণের জন্য দুঃখ হোল দেবব্রতের।

কল্যাণীর দিকে তাকাল। তার পাণ্ডু বিশীর্ণ মুখে ক্লান্তির ছায়া

নেমে এসেছে। কেন যেন চুলে তেল মাখছে না কদিন্ ধরে। ছোট কপালের ওপর কয়েকগাছ চুল এসে পড়েছে। মুখখানি ভারি ম্লান।

দেবব্রত গাঢ় কোমল স্বরে বলল, 'যাও শোও গিয়ে লক্ষ্মীটি।'

কল্যাণী বলল, 'না, আমিই থাকি ওদের কাছে।'

দেবব্রত একটু যেন সোল্লাসে বলল 'আচ্ছা বেশ, দুজনেই একসঙ্গে আজ রাত জাগা যাবে।'

'ওদের টেম্পারেচারটা একবার নিয়ে দেখা যাক। চার্ট কোথায়? এর আগে কত ছিল জ্বর?

কল্যাণী খাতাটা নীরবে এগিয়ে দিল। তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে পারা নামাবার জন্য থার্মোমিটারটা দু'একবার ঝাড়া দেওয়ার সময় হঠাৎ দেবব্রতের মুখ দিয়ে মৃদু গুঞ্জনে বেরিয়ে গেল, 'আমার চোখের রঙে, কামনার রঙে আজি মোর।'

চমকে উঠে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল দুজনে, তারপর দুজনেই চোখ ফিরিয়ে নিল।

মিণ্টু পাশ ফিরতে ফিরতে কাতোরোক্তি ক'রে উঠল, 'মাগো।'

দুর্জ্ঞেয়

কারো কারো শারীরিক গড়নে এমন একেক ধরণের শ্রীহীনতা যাতে অনেক সময় দর্শকের মনে অনুকম্পা এমন কি সহানুভূতি জাগায়; রুগ্ন হীনস্বাস্থ্য লোক দেখলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। কিন্তু আরেক শ্রেণীর কুশ্রীতা আছে যা শুধু চোখকে পীড়িত করেই ছাড়ে না, অস্তিত্বকে পর্যন্ত দুঃসহ করে তোলে।

সামনের ঘরের সতের-আঠার বছরের রাণী নামে যে মেয়েটি রোজ দোতলার রেলিঙে ভর করে এসে দাঁড়ায়, পরিতোষ মর্মে মর্মে অনুভব করেছে তার কুশ্রীতাও ঠিক দ্বিতীয় শ্রেণীর। কলেজে এক কবিবন্ধু তাকে মাঝে মাঝে বলত ক্লাসের দু' একটি মেয়ের সৌন্দর্য তাকে নাকি Simply পাগল করে তোলে। ট্রামে, বাসে, জলসায়, মজলিসে বহুরকমের বহুমেয়েকে সে এবয়সে দেখেছে, কিন্তু এতকাল উন্মত্ততার হাত থেকে রেহাই পেয়ে এসে শেষ পর্যন্ত এই মেয়েটার হাতে সে বুঝি পাগলই হয়ে বসল।

মেয়েটা শুধু যে অস্বাভাবিক শ্রীহীন তাই নয় অসম্ভব রকমের নির্লজ্জও। তার প্রসাধনের ঘটা দেখলে একেক সময় যে হাসি না পায় তা নয়, কিন্তু সে যখন পরিতোষের সঙ্গে কোনরকমে চোখাচোখি হ'লেই মুচকি হাসে, তখন পরিতোষের পায়ের তলা জ্বলে যেতে থাকে। পরিতোষ যখন কলের কাছে হাতমুখ ধোয়, যতক্ষণ সে চৌব্বাচ্চা থেকে বালতি ভরে জল ঢালতে থাকে মাথায়, তখনই কোন না কোন ছলে মেয়েটি এসে দাঁড়ায় ওপরের বারাণ্ডায়।

তার অনুরাগের প্রকাশ শুধু এতেই শেষ হয় না। কোন্ মান্ধাতার আমলের এক ভাঙা হারমোনিয়াম যেন কোত্থেকে জোগাড় করেছে, তার সহযোগে সকাল সন্ধ্যায় রোজ তার সঙ্গীত সাধনা চলে। সাম্প্রতিক সিনেমার চলতি গানগুলিকে তারস্বরে বেতালায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তবে তার তৃপ্তি। তার সবকটিই প্রেমসঙ্গীত এবং বোধহয় পরিতোষের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

বাড়িটায় ঢুকে অবধি পরিতোষের মনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে

গেছে। দাদার যত কাণ্ড। এমন বাড়ি কি নিজে দেখে কেউ পছন্দ করে। কিন্তু সে কথা বলবার উপায় নেই। বললেই বলে বসবেন আর দুখানা ঘর যদি তুই সারা কলকাতা সহরে খুঁজে বার করতে পারিস আমি এই মুহূর্তে এ বাসা ছেড়ে দিতে রাজি আছি। বাড়ি পাওয়া যায় না তা ঠিক। এই বছর খানেকের মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশটা যেন এই কলকাতা সহরে এসে জড় হয়েছে আর তার চার আনি লোক অন্তত কাঁটাপুকুর লেনের এই জীর্ণ বাড়িটায়। ওপরে নীচে সাত ঘর বাসিন্দা। রান্নাঘর বলে আলাদা কোন জিনিষ নেই। শোয়ার ঘরের মধ্যেই রেঁধে নিতে হয়, কিংবা ঘরের সামনে দেড়হাত প্রস্থের বারাণ্ডার তিন হাত করে একেক সরিকের ভাগে পড়েছে তাতেও কেউ কেউ রান্না করে। সকাল সন্ধ্যায় সাতটি চুল্লির যে যজ্ঞধূম ঊর্ধ্বে উত্থিত হতে থাকে তা কাশীমিত্রের ঘাটের ধোঁয়াকেও হার মানায়। পাকা নর্দমার ব্যবস্থা নেই। উঠানের মাঝখানে দিনরাত এক ডাস্টবিন খাড়া করে রাখতে হয়। ভাতের মাড়ে, তরকারির খোসায় সমস্ত আকাশ-বাতাস সৌগন্ধে ভরে ওঠে।

সুখ-সুবিধার চূড়ান্ত। তারপর এই রাণীর অনুরাগ। পরিতোষ বৌদিকে বলে, 'ঘরসংসার তোমরা করো, লোটাকম্বল নিয়ে আমি এবার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব, আর নয়।'

পারুল মুখ টিপে হাসে, 'বৈরাগ্যের কারণ তো জানি। সবুর সইছে না। কিন্তু কি করব ভাই, আমরা হলুম ছেলেপক্ষ, আমাদের কি আগ বাড়িয়ে প্রস্তাব করা সাজে? ওঘরের চক্রবর্তী মশাই আর মাসীমাই বা কি। ওঁদের কি চোখ বলে কোন জিনিষ নেই। ওঁরা কি দেখতে পাচ্ছেন না দিনের পর দিন দুটি হৃদয় ফেটে চৌচির

হয়ে যাচ্ছে ? দেখি অগত্যা আমাকে গিয়েই বলতে হবে। মানের জন্য শেষে কি প্রাণ খোয়াব ? তাছাড়া পট্ করে শেষে যদি একদিন তুমি সন্ন্যাসী হয়েই পড় আমার বাজার এনে দেবে কে ?'

পরিতোষও হাসে, 'এ আর মুখ ফুটে বলবে কি ? ঠাকুরপোর আদর যে বাজারের জন্যই, এতো প্রতিদিনই টের পাচ্ছি।'

স্কুল-ছুটির পর একটা টিউশানি সেরে সরোজ এলো ঘরে। আরেকটা টিউশানি আছে বাসার কাছেই, নিবেদিতা লেনে। দুই টিউশানির ফাঁকে স্ত্রীর হাতের এক কাপ চা পেয়ে সরোজের মেজাজটা এই সময় কিঞ্চিৎ সরস থাকে। পরিতোষের শেষের কথাগুলি তার কানে গিয়েছিল, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সরোজ বল্ল, 'হ্যাঁ কি বলছিলি তখন, কি টের পাচ্ছিস ?'

পরিতোষ জবাব দিল, 'এ বাড়িতে দু'দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

সরোজ স্ত্রীর দিকে তাকায়, 'শাস্ত্রে আছে এ অবস্থায় একটু উন্মাদ-উন্মাদ ভাবই হয়, তাই না ?'

পারুল পরিতোষের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে।

সরোজ আবার বলে, 'কেন বাড়িটা মন্দ কি, তাছাড়া এ বাড়িতে একমাত্র তুই তো স্বতন্ত্র একটা ঘর পেয়েছিস, বলতে গেলে তুই তো এ বাড়ির রাজা।' সরোজের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির আভাস দেখা যায়।

পারুল খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে, 'একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে। ব্যাকরণে কোন ভুল নেই অন্তত।'

কেবল এই সূক্ষ্ম হাসিঠাট্টাতেই ব্যাপারটা যে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। সমস্ত বাড়ি ভরে একথা নিয়ে আলোচনার ঢেউ ওঠে। এ সব বক্র আলোচনা হাসিঠাট্টা চক্রবর্তীদের যে কানে না যায়, তা তা নয়। তবু এতে যেন তাদের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং পরিতোষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার উৎসাহটা তাদের দিনের পর দিন যেন বেড়েই চলেছে।

সেদিন রাত্রে সরোজ তখনও টিউশানি করে ফেরেনি। পারুলের রান্না সব নামতে না নামতেই পরিতোষ নিজেই পিঁড়ি পেতে বসে গেল, বছর চারকের ভাইপো নীপুকে ডেকে পাশে বসিয়ে বলল, 'আয়রে আমরা সব আগেই খেয়েনি। না হ'লে ভিড়ের মধ্যে পতি-সেবায় আরেকজনের আবার অসুবিধা হবে।'

পারুল হেসে বলল, 'গরজ যে কার তাতো বোঝা গেছে। এ অবস্থায় নাকি মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা জ্ঞান থাকে না। আর তোমার দেখি হু হু করে তা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু খাবে কি দিয়ে, কিছুই যে নামেনি এখনও।'

পরিতোষ বলল, 'দাও দাও, আর ভদ্রতা করতে হবে না, এতক্ষণে ভাত যে ফুটোতে পেরেছ এই তো ভাগ্য।'

একটু বাদেই বাটিতে করে কি একটা মাছের তরকারি নিয়ে রাণী এসে দোরের সামনে দাঁড়াল, 'ধরুন তো দিদি, মা পাঠিয়ে দিলেন।'

পারুল বলল, 'ও আবার কি? আহা, ও আবার কেন তুমি নিয়ে এসেছ?'

'আহা ধরুনই না। জাত যাবে না, আমরাও তো ব্রাহ্মণ।'

পারুল মুচকি হাসল, 'ভাগ্যে ব্রাহ্মণ, না হলে এযাত্রা জাত না দিয়ে বুঝি আর পারতুম না আমরা। তা আমাকে ধরতে বলছ কেন? অন্যের হাত দিয়ে দিলে কি আর সাধ মিটবে? নিজেই দিয়ে যাও।'

পরিতোষ কঠিন দৃষ্টিতে পারুলের দিকে একবার তাকালো। অর্থাৎ এধরণের অভদ্র বাড়াবাড়ি সে পছন্দ করেনা। তারপর বলল, 'ওসব আমার দরকার নেই, ফিরিয়ে নিতে বল।'

রাণী আহত কর্কশকণ্ঠে বলল, 'এসেছি কি ফিরিয়ে নেবার জন্যে নাকি? খেতে হয় খান না হয় ফেলে দিন।'

পারুল গম্ভীরভাবে বলল, 'সত্যিই তো, ফিরিয়ে নিতে বললেই কি আর ফিরিয়ে নেয়া যায়।'

রাণী ফিক্ করে হেসে বাটিটা পরিতোষের পাতের সামনে নামিয়ে রেখে সরে গেল।

পরিতোষের যতই দুঃসহ লাগতে লাগল গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতায় রাণীরা ততই নাছোড়বান্দা হ'য়ে উঠল। কোনদিন বা মাছের ঝোল, কোনদিন বা একটা তরকারি প্রায়ই ওঘর থেকে আসে। রাণীর মা কাজকর্মের অবসরে এঘরে এসে বসেন, নানা গল্পগুজব করেন, কোনদিন বা বঁটিটা টেনে নিয়ে নিজেই কুটনো কুটতে আরম্ভ করে দেন।

পারুল বলে, 'আহা হা, আপনি কেন আবার—?'

রাণীর মা বলেন, 'তাতে কি। এক জায়গায় থাকতে গেলে আমারটা তুমি দেখবে তোমারটাও আমি দেখব; এ না হ'লে কি চলে? দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই সাতসকালে উঠে আপিসের রান্না, তাও যদি শরীরটা তোমার শক্ত থাকতো। অত পর-পর ভাব কেন মা, যখন

যা, অসুবিধা বোঝ আমাকে বলতে পার, রাণীকে বলতে পার—একটুও লজ্জা কোরোনা মা, লজ্জা করলে কি আর সহর-বন্দরে মানুষ চলতে পারে ?"

পারুল মনে মনে হেসে ঘাড় নাড়ে, 'তা তো ঠিকই।'

হঠাৎ রাণীর মা বলেন, 'এবাড়িতে তোমার দেওরই তো দেখি সবচেয়ে আগে বের হয় আপিসে, কোন আপিসে কাজ করে যেন ?'

পারুল বলে, 'ডি. জি. এম. পি.।'

রাণীর মা নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করেন, 'মাইনে পায় কত ?'

পারুল গম্ভীরভাবে বলে, 'জানিনে।'

পর মুহূর্তে নিজের রূঢ়তা বুঝতে পেরে মোলায়েম সুরে খানিকটা নালিশের ভঙ্গিতে বলে, 'কি করে জানব মাসীমা ? আমাকে কেউ কিছু কি বলে ? যেমন দাদা তেমনি তার ভাই, আজকালকার চাকুরেদের ধরণই আলাদা। তাদের মাইনের কথা জিজ্ঞেস করা যেন মস্ত বড় এক অভদ্রতা।'

শুষ্ক হেসে রাণীর মা তাড়াতাড়ি কথা ফিরিয়ে নেন, 'তা আর কি করবে মা, যে কালের যা রীতি।'

নানাছলে রাণীও দু'তিন বার দিনের মধ্যে এঘরে আসবেই। বিকেলের দিকে এসে বলে, 'আমার চুলটা একটু বেঁধে দিন না দিদি।'

পারুল বলে, 'হুঁ আমি এখন তোমার চুল বাঁধতে বসি, আর আমার রাজ্যের কাজ পড়ে থাকুক।'

'আপনার কাজ যেন কেবল পড়েই থাকে। আর কেউ কি আর কুটোগাছটাও নেড়ে দেয় আপনার ?'

কথাটা অসত্যি নয়। সুযোগ পেলেই রাণী পারুলের সাহায্য করতে আসে। ঘর ঝাঁট দেয়, বিছানা পাতে, রুটি বেলে দেয়, কোলের ছেলেকে ঝিনুক ভরে দুধ খাওয়াতে বসে। পারুল প্রথম প্রথম ভারি অস্বস্তি বোধ করত আজকাল আরামই পায়। সত্যি কাজকর্মে এমন আটপিঠে শক্তমেয়ে আজকালকার দিনে পাওয়া কঠিন। আহা মেয়েটা যদি অমন কুশ্রী আর হ্যাংলা না হ'ত, তাহলে লেখাপড়া না জানার জন্য এসে যেতনা, তা শিখিয়ে নিতে আর কতক্ষণ লাগত।

সেদিন আপিস থেকে এসে ঘরে ঢুকে হাতঘড়িটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে হঠাৎ পরিতোষ তারস্বরে চীৎকার ক'রে ডাকল, 'বউদি, বউদি।'

পারুল আসতে আসতে সাড়া দিল, 'অত জোরে চেঁচাচ্ছ কেন ঠাকুরপো, কানে খাট তোমার দাদা, আমি তো নয়।'

'ঠাট্টা রাখ, আমার এই বইগুলির ওপর এমন বিশ্রীভাবে নাম লিখে গেল কে? বিদ্যে ফলাবার আর জায়গা পেলনা?'

লেখার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পারুল মুচকি হাসল, 'ঠিক জায়গায় ফলিয়েছে বলেই তো মনে হয়।'

পরিতোষ এবারে কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল, 'তামাসা ছেড়ে দাও, দিনরাত তো কেবল ঐ নিয়েই আছ। নিজেও যেমন প্রশ্রয় পেয়েছ, অন্যকেও তেমনি প্রশ্রয় দিচ্ছ। রুচি আর সাধারণ সম্মানবোধ বলে তোমার কিছু আছে, এতকাল আমার ধারণা ছিল।'

পারুল মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লেও আবহাওয়াটাকে হাল্কা করবার চেষ্টায় হেসে বলল, 'বড় বড় বক্তৃতার আড়ালে নিজের মনের কথা

ঢাকতে কেন বৃথা চেষ্টা করছ ঠাকুরপো, হাতের লেখা যেমনই হোক লিখেছে তো তোমারই নাম।'

পরিতোষ সে কথায় কান দিলনা, তেমনি রূঢ় কণ্ঠেই বলে যেতে লাগল, 'সংসারে এমন কি কাজ যা করতে তোমাকে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, যাতে অন্য কারো সাহায্য না নিলে একবারেই চলে না। সন্ধ্যায়-সকালে ঝি তো একটা আসছেই, এর পরেও যদি সাহায্যের দরকার বোধ করো দাদাকে বলো, তাকে সব সময় রাখবার ব্যবস্থা করে দেবে। ঠাট্টা তামাসার মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে একটা অন্য ঘরের বয়স্থা মেয়েকে দিয়ে নিজের সব কাজ করিয়ে নেয়া আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। তোমার রুচিতে সেটা না বাধতে পারে কিন্তু আমার বাধে।'

পারুল তরল পরিহাসের কণ্ঠে আরো কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পরিতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা।'

অস্বস্তিতে সমস্ত মন ভরে উঠল পরিতোষের। এমন গায়ে পড়ে প্রেমে পড়বার চেষ্টা যদি না করত মেয়েটি, তার কদর্য চেহারা সত্ত্বেও পরিতোষ হয়ত খানিকটা সহানুভূতি বোধ করতে পারত। মেয়েটি যদি মনে মনেই তাকে ভালবাসত, তার প্রতিদান দিতে না পারলেও তার জন্য একটু করুণা, একটু অনুকম্পা না এসেই পারত না। শুধু তাই নয়, গোপনে গোপনে আত্মপ্রসাদ বোধ করে নিজের মনও পরিতোষের কিছুটা প্রসন্ন ও সরস হ'য়ে উঠত। কিন্তু শিক্ষাহীন, রুচিহীন আচার-ব্যবহার, আর শ্রীহীন চেহারা নিয়ে রাণী

যে সরবে বাড়ি ভরে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে যে তাকে সে ভালবেসেছে, পরিতোষের পক্ষে এর চেয়ে অপমানকর আর যেন কিছু নেই। বাড়িভরা লোকের ঠাট্টা-পরিহাসের পিছনে এ ধরণের একটা মনোভাবই কি নেই যে আসলে পরিতোষ এই ধরণের একটি মেয়েরই উপযুক্ত? এর চেয়ে ভাল কোন মেয়ে তাকে ভালবাসতে পারে না?

শ্যামবাজারের এক যজমানের বাড়িতে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সেরে চক্রবর্তী মশাই এই সময় ফিরে এলেন। পরিতোষের ঘরের সামনে দিয়েই পথ। ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে পরিতোষকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'এই যে, ছুটি হ'ল আপিস?'

কণ্ঠস্বরের স্নেহের আতিশয্যে পরিতোষের শরীর রি রি করে উঠল। তবু রক্ষা, ইতিমধ্যে জামাতা বাবাজী বলে সম্বোধন করেনি। রূঢ় শুষ্ক কণ্ঠে পরিতোষ বলল, 'হ্যাঁ হোল। শুনুন চক্রবর্তী মশাই, কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

কথার ভঙ্গিতে চক্রবর্তী যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

'কী কথা?'

'ঘরে আসুন।'

চক্রবর্তী মশাই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।

পরিতোষ একটু চুপ করে থেকে কথাটাকে সাধু ভাষায় গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনাকে যদি কেউ মিথ্যে আশা দিয়ে থাকে তার জন্য দায়ী আমি নই। কিন্তু ঠাট্টা-তামাসায় না ভুলে নিজের অবস্থা বুঝবার বয়স আপনার হয়েছে।'

চক্রবর্তীমশাই বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'এসব কথা কেন উঠল আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

পরিতোষ সশ্লেষে হাসল, 'কিছুই বুঝতে পারছেন না? না বুঝতে পারায় যেখানে সুবিধে সেখানে আমরা বুঝতে চাইও না, কিন্তু এক্ষেত্রে তা মনে করবেন না।'

চক্রবর্তী চুপ করে রইলেন।

পরিতোষ বলল, 'বেশ, আপনি যদি বুঝতে না পেরে থাকেন আমাকে আরো স্পষ্ট ভাষাতেই বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, তা'হলেই ভালো হয়।' চক্রবর্তীর কণ্ঠেও এবার খানিকটা ঝাঁঝের আভাস পাওয়া গেল।

পরিতোষ আরো মরিয়া হয়ে উঠল, 'ভালো হয়? তা হলে শুনুন। আপনার মেয়ে আমার ঘরে এসে আমার বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে, যখন তখন এদিকে নির্লজ্জের মত অমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, এসব আমি মোটেই পছন্দ করিনে। আর এ ধরণের গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতা করে কিছু যে লাভ হবে তাও আমার মনে হয় না। তার চেয়ে সময় থাকতে আপনাদের অন্যত্র চেষ্টা করাই বোধ হয় ভালো, কথাটা আপনার স্ত্রী এবং কন্যাকে একটু বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলবেন।'

মুখ কালো করে চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন এবং ঘরে গিয়েই সুরু করলেন, 'মান-সম্মান কিছু আর রইলো না, কই সে হারামজাদী গেছে কোথায়? ফের যদি আবার ওমুখো হতে দেখি ঠেঙিয়ে পা ভেঙে দেব একেবারে। ছি ছি ছি। আর স্পর্ধা দেখ ছোঁড়াটার। কত বড় দেমাক। অমন নির্লজ্জ দুশ্চরিত্র ছেলের হাতে মেয়ে দেবার জন্য যেন জিভ দিয়ে জল পড়ছে আমার, তার আগে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে পারব না?'

পরিতোষের ঘরের সামনে এসে নীপু বলল, 'কাকা, মা ডাকছে তোমাকে, এস শিগ্‌গির চা খেয়ে যাও।'

পরিতোষ জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'বল গিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি, বাইরে গিয়ে চা খাব।'

নীপু নেচে উঠল, 'কাকু, দাঁড়াও আমিও আসছি, আমিও তোমার সঙ্গে বাইরে চা খাব।'

পরিতোষ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ।'

কয়েকদিন চক্রবর্তী-গৃহিনীর তারস্বর অবিশ্রান্ত চলল। তারপর শুধু আসা-যাওয়া নয়, দুই পরিবারের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল। কারো সঙ্গে যে কারো পরিচয় মাত্রও আছে তা এদের হাব-ভাবে কিছুতেই আর বোঝবার জো রইল না।

কয়লা একেবারেই দুর্ঘট হয়ে উঠেছে কলকাতায়। অনেক খুঁজে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এক বন্ধুর সহায়তায় জোড়াবাগান অঞ্চল থেকে দুমণ কয়লা নিয়ে এলো পরিতোষ। রবিবারের সমস্ত বিকেলটাই মাটি। পারুলকে বলল, 'একটু কম কম করে খরচ কর দেখি বউদি, এত কয়লা লাগে কিসে?'

পারুল একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন থেকে বোধ হয় কয়লার আর দরকার হবে না।'

'কেন?'

পারুল একটু মুচকি হাসল, 'মানুষের মনের আঁচেই রান্না সেরে ফেলতে পারব।'

পরিতোষ চটল না, হেসে বলল, 'তা যদি পারতে তো আমার

আপত্তি ছিল না, কয়লা আনায় যা পরিশ্রম। কিন্তু কাজে নেই সে এক্সপেরিমেন্টে।'

পারুল বলল, 'কেন?'

পরিতোষ জবাব দিল, 'রান্না শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আঁচ যদি শেষ না হয়, যদি গিয়ে রাঁধুনীর গায়ে লাগে?'

মুহূর্তের জন্য পারুলের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, তারপর বলল, 'সেজন্য ভয় নেই তোমার। রান্না করতে করতে হাত এত পেকে গেছে যে আঁচ ওঠাতেও যেমন জানি, নেবাতেও তেমনি।'

তিন চারদিন বাদে সকালে এসে পারুল বলল, 'আর এক মণ কয়লা আনতে হবে ঠাকুরপো।'

পরিতোষ সবিস্ময়ে বলল, 'বলো কি?'

পারুল শুষ্ককণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, না হ'লে এবেলার আপিসের রান্নাই হবে না। আর এরপর থেকে কয়লা বাইরে সিঁড়ির নীচে আর রাখা হবে না। তোমার এই ঘরের মধ্যে রাখতে হবে। কয়লা যে চুরি যাচ্ছে এ আমার আগে থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, কাল স্বচক্ষে দেখলাম। সত্যি মেয়েটার যে এমন হীন প্রবৃত্তি হবে ভাবতে পারি নি।'

'কি ব্যাপার? কে আবার চুরি করল তোমার কয়লা?'

পারুল সবিস্তারে বলতে আরম্ভ করল, 'তবে শোন, কাল রাত্রে দোর খুলে বাইরে এসে কেবল বাথরুমটার কাছাকাছি পর্যন্ত গেছি, দোতলার সিঁড়ির নীচ থেকে রাণী অমনি ফস্ করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তার কাঁখে ছোট ঝাঁকাটা, যেটায় তারা কয়লার টুকরো রাখে। আশ্চর্য কোন ভদ্রলোকের মেয়ে যে এমন—'

হঠাৎ পরিতোষের মুখটা অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে গেল, যেন দারুণ একটা কঠিন আঘাত লেগেছে তার মনে। কিন্তু পরমুহূর্তে বলল, 'হাতে হাতে ধরে ফেললেনা কেন?'

পরিতোষের মুখের পরিবর্তনটা পারুলের চোখ এড়ায়নি, বলল, 'আমি ধরলে আর লাভ হত কি, যে ধরলে সত্যি সত্যি ধরা পড়ত—'

পরিতোষ রুক্ষ বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমার ঐ বস্তাপচা রসিকতা এবার থামাও তো দেখি।'

ভারি খারাপ লাগতে লাগল পরিতোষের। মনে হতে লাগল রাণীর এই হীন চৌর্যবৃত্তি পরিতোষের নিজের পক্ষেও যেন অত্যন্ত লজ্জাকর এবং অপমানের। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সমস্বরে মা আর মেয়ে তাদের লক্ষ্য করে যে সব অকথ্য গালিগালাজ আরম্ভ করল, তাতে পরিতোষের বিতৃষ্ণার আর অবধি রইল না। পারুল কি বলতে যাচ্ছিল, পরিতোষ বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'চুপ কর, ওদের সঙ্গে আমরাও কি ইতর হব।'

টুকটাক্ আলাপ আলোচনা কানে আসে, রাণীর নাকি বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ক'রে চক্রবর্তী মশাই সরোজের সঙ্গে আবার আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন, কেনাকাটার ব্যাপারে তিনি তাঁর পরামর্শ চাচ্ছেন এবং সরোজও তা দিতে কার্পণ্য করছে না। কিন্তু ঘর নিয়ে মহাসমস্যায় পড়েছেন চক্রবর্তী। তাঁর ঐ একখানা মাত্র ঘর, তাও গৃহস্থালীর আসবাবপত্রে ঠাসা। সে-ঘর যদি কনে জামাইয়ের জন্য ছেড়ে দেন অন্যান্য ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজেরা যাবেন কোথায়? ইতিমধ্যে দু'চারজন স্বজন বন্ধুদের বাসায় ঘরের

খোঁজ নিয়েছেন, কিন্তু কেউ তেমন ভরসা দিতে পারেনি। এ-সব শুনে সরোজ সেদিন নিজেই উপযাচকভাবে বলল, 'সে জন্য ভাবনা কি, পরিতোষ না হয় এক রাত্রের জন্য তার বন্ধুর মেশে গিয়ে শোবে। আপনি ওর ঘরেই মেয়ে-জামাইকে তুলতে পারবেন, কোন অসুবিধা হবে না।'

এই উদারতায় ওপক্ষ থেকেও বেশ সাড়া এল। বিয়ের দুদিন আগেই রাণীর মা এসে পারুলকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন, 'সব দেখে শুনে করে দিতে হবে মা। এখানে তো আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, তোমরাই ভরসা।'

পারুলও বলল, 'তা কি আর অত করে আপনাকে বলতে হবে মাসীমা? আমরা করব না তো করবে কে?'

কিন্তু সত্যি সত্যি পারুলের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হোল না। বিয়ের দিন ভোরেই ভবানীপুর থেকে খবর এলো পারুলের মা ব্লাডপ্রেসারে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অবস্থা ভালো নয়, কখন কি হয় বলা যায় না। খবর পেয়ে সরোজ স্ত্রীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেল।

রবিবার, আপিস নেই। ইচ্ছে হ'লে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসা যেত। কিন্তু কেন যেন তেমন উৎসাহ বোধ করল না পরিতোষ। ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে অলস, অন্যমনস্ক-ভাবে একটা বইয়ের পাতা উল্টে যেতে লাগল।

রাণীকে মেয়েরা স্নান করাবার জন্য বাইরে নিয়ে এসেছে, একটি বউ তার মাথার ওপরে এক ঘটি হলুদ জল ঢেলে দিল। লালপেড়ে

খাটো সাড়িখানা স্থানে স্থানে হলুদে রঙে ভরে উঠল, আর রাণীর সমস্ত চোখমুখ সলজ্জ চাপা আনন্দে। ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বইয়ের পাতায় মন দিল পরিতোষ।

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেছে। বর-কনেকে নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে দাদার ঘরে এসে আশ্রয় নিল পরিতোষ। শীতের রাত, তাই গোটা বারোর মধ্যেই এয়োরা ওদের রেহাই দিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল। শুয়ে শুয়ে তাও টের পেল পরিতোষ। তারপর তার কানে আসতে লাগল ওদের অস্ফুট মৃদু কথাবার্তা। চাপা হাসির শব্দ আর চুড়ির মিষ্টি আওয়াজ। ঘরখানা হঠাৎ যেন এক অপূর্ব রহস্যে আর ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে।

বিয়ের আসরে কে যেন তার জামায় খানিকটা আতর ছিটিয়ে দিয়েছিল। আলনায় ঝুলান সেই জামাটা থেকে মৃদু বাতাসে মাঝে মাঝে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। সব কিছু মিলে অদ্ভুত এক স্বপ্নাচ্ছন্নতা। দেখতে দেখতে এক রহস্যময় অহেতুক বেদনায় পরিতোষের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। এর পর সুশ্রী শিক্ষিতা কোন না কোন মেয়ের অতি-ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে পরিতোষ নিশ্চয়ই একদিন আসবে। কিন্তু এই যে মেয়েটি যার শ্রী নেই, রুচি নেই, প্রয়োজন হলে চুরি করতে যে দ্বিধা করে না, তার দেহের উত্তাপ আর হৃদয়ের স্পর্শ না যেন আরো কত বিচিত্র, আরো কত রহস্যময়। সে রহস্যের দ্বার পরিতোষের কাছে কোনদিনই কি আর খুলবে?

সেভার

শ্বশুর শাশুড়ী উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলিমা বসবার টুলটাকে স্বামীর বিছানার আরো কাছে এগিয়ে নিয়ে এলো। তার পর তার শীর্ণ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'একটা কথা বলব শুনবে?'

সুবিমল ম্লান একটু হাসল, 'কেন শুনব না, বলো।'

নীলিমা বলল, 'আগে কথা দাও আপত্তি ক'রবে না, রাগ ক'রবে না।'

সুবিমলের দু'পাশে সারে সারে আরো চোদ্দ-পনেরটি বেড। রোগী আর তাদের দর্শনার্থী আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে হাসপাতালের এই ঘরটি ভরে উঠেছে। নীলিমার গলার স্বরে কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকাল। কিন্তু নীলিমার কোন খেয়াল নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই কারো দিকে। স্বামী-সম্ভাষণের এমন উপযুক্ত ক্ষেত্র এমন নিবিড় অবকাশ যেন আর কোন দিন সে পায়নি।

সুবিমলের হাতে আর একটু চাপ দিল নীলিমা, বলল, 'রেখা বউদির কথা মনে আছে তোমার? আমার মামাত-ভাই নীরদা'র বউ। তিনি কাল এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। বললেন, এক দিন হাসপাতালেও আসবেন তোমাকে দেখতে। রেখা বউদিরই পিসে মশাই হ'ন সম্পর্কে, রায় সাহেব পি, এন, বিশ্বাস। তাঁরই ছোট ছোট দুটি নাতনীকে বিকেলে গিয়ে গান শেখাতে হবে। রেখা বউদি বলছিলেন আমি যা জানি তাতেই চলবে। টাকা পঁচিশেক তো ওঁরা দেবেনই, বেশিও দিতে পারেন।'

সুবিমল আস্তে আস্তে বলল, 'কুটুম্ব-স্বজনের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত গানের মাষ্টারীও গিয়ে ক'রতে হবে তোমাকে ?'

নীলিমা বলল, 'আহা-হা ভারি তো মাষ্টারী, মাষ্টারী করবার মত গান যেন আমি জানি। আর কুটুম্বও তো খুব। মামাতো ভাইয়ের পিসে-শ্বশুর। তাঁর কাছ থেকে টাকা নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, বরং এক হিসেবে লাভ আছে। প্রথমেই একেবারে অজানা-অচেনার মধ্যে গিয়ে পড়বার ভয় নেই।'

সুবিমল বলল, 'কিন্তু বাবা-মা রাজী কি হবেন ?'

নীলিমা জবাব দিল, 'সে জন্য ভেব না। সে ভার আমার ওপর, এক রকম নিমরাজী তাঁরা হয়েছেন।'

সুবিমল বিস্মিত হোল না। যে শ্বশুর-শাশুড়ী বিয়ের পর মাত্র কয়েকটি মাসের জন্য পুত্রবধূকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা দিতে দেননি, ছেলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলা-মেশায় আপত্তি করেছেন তাঁরাও যে আজ নীলিমাকে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দিতে পারেন, একথা সুবিমলের কাছে আজ অবিশ্বাস্য মনে হোল না। এই বছর দু'য়েকের মধ্যে তাদের সংসারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। থাইসিসে আক্রান্ত হয়ে সে এসেছে যাদবপুরের এই হাসপাতালে। প্রথম বছর ফ্রী-বেড মেলেনি। চিকিৎসার খরচ বাবদ মোটা টাকা লেগেছে মাসে মাসে। বুড়ো বাপ দেশী একটা মার্চেন্ট অফিসে হিসেব লেখেন। অসুখ-বিসুখ দূরের কথা, সংসারের দৈনন্দিন অনেক খরচই তাঁর হিসাবের বাইরে গিয়ে পড়ে। ইদানীং সুবিমলের চাকরিই ছিল ভরসা। তাই অসুখের প্রথম ধাক্কাতেই তাঁকে হাত দিতে হয়েছে স্ত্রী আর পুত্রবধুর গয়নায়, হাত পাততে হয়েছে স্বজন-বন্ধুদের কাছে। কিন্তু

তাঁদের সংখ্যা অগণ্য নয়, ধার দেওয়ার ক্ষমতারও সীমা আছে। বাসন-কোসন গেছে, সামান্য আসবাবপত্র অদৃশ্য হয়েছে, তবু রোগ রেহাই দেয়নি।

সংসারের খরচ কম নয়, ভাই-বোনেই স্থবিমলেরা ছ'টি। ভাগ্যের ফেরে স্থবিমলের ঠিক পরেই দুটি অনূঢ়া বয়স্থা মেয়ে। কন্যাদায়ের চিন্তা ছাড়া বাপ-মায়ের আর কিছু তারা বাড়াতে পারেনি। ছেলেরা এখনো স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়ে।

তবু অনেক চেষ্টা-চরিত্র ধরাধরির ফলে মাস কয়েক হোল হাস-পাতালে স্থবিমলের জন্য ফ্রী-বেডের ব্যবস্থা হয়েছে, বড় রকমের খরচ কিছু লাগে না। কিন্তু দু'একটা ওষুধের দাম আর টুকটাক হাতখরচ বাবদ ফী-মাসেই পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দরকার হয়। স্থবিমল জানে, এই ক'টি টাকা পাঠাতেও বাপের সাধ্য আর এখন নেই। কিছু কাল ধরে নিজের ব্যবস্থা নিজেই তাই তাকে করতে হচ্ছে। কলকাতার বন্ধুদের কারো কাছে হাত পাততে আর বাকি নেই। ইদানীং তাদের কাছ থেকে টাকা আর সে চায় না, চায় ঠিকানা। বন্ধুর বন্ধু, তস্য বন্ধুরা সারা ভারতবর্ষ ভ'রে কে কোথায় আছে, কে কোথায় ভালো চাকরি করছে জানতে চায় স্থবিমল।

অনেকেই চিনতে পারে না, অনেকের কাছ থেকেই জবাব পাওয়া যায় না। সকলে সমান নয়, কেউ কেউ আবার দেয়ও। ভরসা দেয় থাইসিস রোগটা আজকাল আর এমন কিছু মারাত্মক নয়, বিশেষত গোড়াতেই যখন ধরা পড়েছে। কেউ কেউ দু'-এক মাস পাঁচ-দশ টাকা পাঠায়, কিন্তু তার পর হয় আর তাদের সাড়া মেলে না, না হয় অত্যন্ত হাত-টানাটানির খবর আসে।

এমনি দু'তিনখানা চিঠি স্বামীকে দেখতে এসে গতবার নীলিমার হাতে পড়েছিল।

সুবিমল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাঁরা যদি রাজী থাকেন তবে আর কি। অন্যের কাছ থেকে ভিক্ষে নেওয়ার চেয়ে তোমার রোজগার আমি সহজভাবেই নিতে পারব।'

নীলিমার চোখ ছলছল ক'রে উঠল, 'অমন ক'রে ব'লো না।'

স্ত্রীর সেই জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে সুবিমল কি যেন দেখল; তার পর কোমল কণ্ঠে বলল, 'মান-অপমানের কথা নয়, আমি ভাবছি তোমার শরীরের কথা, সংসারের অত খাটুনির পরে আবার কি গান শেখানোর পরিশ্রম দেহে সইবে? দু'দিনও তো শরীর টিকবে না তোমার।'

নীলিমার মনে পড়ল অফিসের কাজের পরে সুবিমল যখন টিউশানিতে বেরুত নীলিমা ঠিক এই ধরণের কথাই বলত। স্বামীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করত নীলিমা। সেই আশঙ্কাই আজ নিষ্ঠুর সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন সুবিমলের মুখে সেই কথা। নীলিমার স্বাস্থ্যের জন্য ঠিক তেমনি ধরণের উদ্বেগ দেখা দিয়েছে স্বামীর মনে। এমন কি হয় না, নীলিমার মত সুবিমলের এই উদ্বেগ আর আশঙ্কাও এমনি সত্যি সত্যি ফলে যায়। আর সুবিমল সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে ওঠে। তাহলে বেশ মজা হয়, তাহলে নীলিমা উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারে স্বামীর ওপর।

সুবিমল বলল, 'হাসছ যে।'

নীলিমা বলল, 'হাসছি তোমার কথা শুনে, আমার আবার শরীর! তার জন্য তোমার এত ভাবনা!'

সুবিমল বলল, 'অত বিনয় ভালো নয়। তোমার শরীরের জন্য ভাবব না, তোমার মনের জন্য ভাবব না, তবে ভাবব আর পৃথিবীতে কিসের জন্য ?'

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে সুবিমল একটু হাসল।

নীলিমার মুখে কেমন যেন একটু ছায়া পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তে সে-ও হাসিমুখে জবাব দিল, 'কিছু ভেব না, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

কালীমোহন তবু আমতা আমতা করলেন, বললেন, 'লোকে কি বলবে !'

মনোরমা বললেন, 'আর সে সব যদি আমার সুবুর কানে যায় তাহলে তারই বা কেমন লাগবে।'

অতি দুঃখে নীলিমার হাসি পেল। স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী সকলের মনে সেই একই প্রশ্ন, সেই একই বিপদের আশংকা। অভাব অনটন সমস্ত সংসারকে গিলে ধ'রেছে কিন্তু স্থির আছে সেই অবিশ্বাস, সেই কুটিল সংশয়-প্রবণতা।

নীলিমা জবাব দিল, 'অত ভাবছেন কেন মা, আজকাল কত মেয়েই এমন তো করছে। এতে নিন্দার কিছু নেই। আর নিন্দা-বন্দনার দিকে কান দেওয়ার এই কি আমাদের সময় ?'

অন্য কোন সময় হ'লে পুত্রবধূর মুখে এই সব ছাপার অক্ষরের বড় বড় কথা মনোমরা সহ্য করতেন না, কিন্তু এখন চুপ ক'রে রইলেন।

রেখাই প্রথম 'পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভাল নিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে এসে বলল, 'চল ঠাকুঝি।'

পায়ে পুরোন একজোড়া স্যাণ্ডাল, পরণে অনেক কাল আগের রঙ ফিকে হয়ে যাওয়া একখানা শাড়ি। রেখা তার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলি বলি ক'রে চুপ ক'রে গেল।

নীলিমা শ্বশুরের সামনে গিয়ে বলল, 'তাহলে আসি বাবা।'

কালীমোহনের কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে এল, বললেন, 'এসো মা। নিতান্ত দুরদৃষ্ট নাহ'লে কুললক্ষ্মী তুমি, তোমাকে আজ বেরোতে হয় টাকার চেষ্টায়।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু এ সময় ঝি-গিরিতেও যে আমার অপমান নেই বাবা।'

কালীমোহন বললেন, 'তবু আমি বেঁচে থাকতে—'

নীলিমা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আপনি বিচলিত হবেন না বাবা।'

কালীমোহন বললেন, 'না, আর বিচলিত হব কেন। আশীর্বাদ করি তোমার কষ্ট যেন সার্থক হয়।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'খুব দেখে-শুনে সাবধান মত চ'ল মা।'

রেখা হেসে বলল, বউকে বুঝি খুব দূর দেশে পাঠাচ্ছেন তাঐমশাই। ভবানীপুর থেকে কালীঘাট,—ট্রামের মাত্র গোটাকয়েক ষ্টপেজ, তাতেই ভেবে এত সারা হচ্ছেন। ভয় নেই, ঘণ্টাখানেক বাদেই আপনাদের বউকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

রায় সাহেবের এ-বাড়িতে কি একটা বিয়ের নিমন্ত্রণে নীলিমা এর আগে আরো একবার এসেছিল। কিন্তু সে আসায় আর এ আসায়

'পার্থক্য অনেক। বাড়ির ভিতর ঢুকতে গিয়ে নীলিমার পা যেন হঠাৎ আর এগুতে চাইল না, মন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে উঠল।

রেখা বলল, 'কি ব্যাপার, এত ভাবছ কি? দিন-রাত অমন ভাবনা কিন্তু ভালো নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের কথা মনে পড়ল নীলিমার, মনে পড়ল স্বামীর রুগ্ন শীর্ণ মুখ, নিজেদের নিঃসম্বল দীনতার কথা।

নীলিমা একটু হাসতে চেষ্টা করল, বলল, 'সে কথা ঠিক। চল।'

রেখার পিসীমা পিসেমশাই নীলিমাদের সাদরে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

রায় সাহেব বললেন, 'কোন সংকোচ কোরো না মা।'

কাত্যায়নী বললেন, 'বাঃ সংকোচ আবার কিসের। এ কি পরের বাড়িতে এসেছে না কি।'

পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন কাত্যায়নী। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান্ পুত্র, সুন্দরী পুত্রবধূ, সাত-আট বছরের চঞ্চল সপ্রতিভ দুটি মেয়ে, চমৎকার দেখতে।

কাত্যায়নী বললেন, 'এরাই তোমার ছাত্রী নীলিমা—অঞ্জু আর মঞ্জু, ভালো নাম কৃষ্ণা আর কাবেরী। পরিচয়ের সময় সঙ্গে সঙ্গে ভালো নাম দুটিও আমাকে ব'লে দিতে হয়, না হ'লে ফল ভালো হয় না।' কাত্যায়নী হাসলেন।

দোতলার দক্ষিণ দিকের একটি ঘরে নীলিমাকে নিয়ে এলেন কাত্যায়নী। মেঝের ওপর দামী গালিচা পাতা। এক দিকে বাজনার সরঞ্জাম। বাঁয়া তবলা ছোট-বড় গুটি তিনেক সেতার নীল রঙের ঢাকনিতে ঢাকা।

কাত্যায়নী বললেন, 'সপ্তাহে দু'দিন ওস্তাদ আসেন অঞ্জু মঞ্জুকে সেতার শেখাবার জন্য। সেই সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাবাও শেখে। খুব ভালো সেতার বাজায় আমাদের খোকা, এক দিন শুনো।'

নীলিমা বলল, 'গান-বাজনার দিকে সকলেরই বেশ ঝোঁক আছে বুঝি এ-বাড়িতে।'

রায় সাহেব পিছনে পিছনে এসেছিলেন। হেসে বললেন, 'তা একটু আছে। পেশায় আমরা চামার হ'লে হবে কি মা, নেশাটা সকলেরই একটু মোলায়েম।'

সহরতলীতে রায় সাহেবের ট্যানারী খ্যাতিলাভ করেছে।

সুমিতা বলল, 'বাবাও বেশ চমৎকার তবলা বাজাতে পারেন।'

ভূমিকা হিসাবে হারমনিয়ম বাজিয়ে খানদুই গান গাইল নীলিমা। খুব ভালো জমল না। দু'-এক জায়গায় তালও কাটল। রায় সাহেব ভ্রূ কুঁচকালেন।

রেখা ননদের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করে বলল, 'অনেক দিন ধরে চর্চা নেই কি না।'

কাত্যায়নী বললেন, 'থাকবার কথাও তো নয়। মনের যে শান্তিতে এখন রয়েছে।' নীলিমার দিকে চেয়ে বললেন, 'সব আমরা শুনেছি মা, রেখার কাছে। কেমন আছে আজকাল সুবিমল। সত্যিই ভারি কষ্ট হয় তোমার শ্বশুরের কথা ভেবে। এ বাজারে সংসারের খরচ চালিয়ে আবার হাসপাতালের খরচ জোগানো কি সহজ কথা! আর এ হ'ল একেবারে রাজা-রাজড়াদের ব্যাধি। রীতিমত রাজসূয় যজ্ঞ।'

"নীলিমার গুণের চেয়ে, তার প্রয়োজন, স্বামীর অসুস্থতায় অর্থ সাহায্যের কথাই যে ওঁরা বেশি বিবেচনা ক'রেছেন একথা নীলিমাও বুঝল, ওঁরাও বুঝিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লেও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু বিঁধতে লাগল নীলিমার।

ফেরার পথে রেখা বলল, 'গান-বাজনাটা তোমাকে আরও একটু ভালো করে চর্চা করতে হবে ভাই।'

নীলিমা গম্ভীর ভাবে বলল, 'তা তো হবেই।'

ওস্তাদ রেখে গান-বাজনা শেখার সুযোগ নীলিমা কোন দিন পায়নি। গরীব বাপের পক্ষে সে ব্যবস্থা করা সম্ভবও ছিল না। রেকর্ড রেডিয়ো শোনা বিদ্যা। স্কুলে গানের ক্লাসও মাঝে মাঝে দু'এক বছর হ'ত, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যেত। মাইনে উঠত কম। স্কুলের তহবিলে কুলোত না। নিজের উদ্যম উৎসাহেই যা কিছু শিখেছিল নীলিমা। শ্বশুরবাড়িতে এসে সব আবার চাপা পড়ে গিয়েছিল। শ্বশুর-শাশুড়ী জিনিসটা বিশেষ পছন্দ করতেন না, সুবিমলেরও যেএদিকে খুব সখ-আগ্রহ ছিল তা নয়। তার পর এই দু'বছর ধরে গানের কথা ভাববার নীলিমার ইচ্ছাও হয়নি, সময়ও হয়নি। অ[illegible] হোল। সখ নয়, আনন্দ নয়, প্রয়োজন আর পেশা। একটু অভ্যাস করে না গেলে ছাত্রীদের কাছে মান থাকবে না, এমন কি চাকরি যেতেই বা কতক্ষণ। কিন্তু চাকরি গেলে চলবে না নীলিমার। যেমন ক'রেই হোক স্বামীর হাসপাতালের খরচ তাকে সংগ্রহ করতেই হবে। পরিচিত [illegible]দের কাছে আর তাঁকে সে ভিক্ষা ক'রতে দেবে না। তার চেয়ে নিজে ভিক্ষা করবে সেও ভালো।

বাড়ির অন্য কেউ উঠবার আগে খুব ভোরে উঠে গলা সাধতে

বসে নীলিমা.। দিন ভ'রে চলে সংসারের কাজ। দুপুরে কোন কোন দিন অবসর পেলে গানের সঙ্গে হারমনিয়ম বাজিয়ে হাত আর গলাটাকে চোস্ত রাখে, বিদ্যাটাকে একটু ঝালিয়ে নিতে চেষ্টা করে নীলিমা। যেদিন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যায় সে দিন রাত্রেও আসর বসে নীলিমার ঘরে। দুই ননদ শান্তি আর সুধা এসে জোটে, বলে, 'বউদি আমরাও শিখব, আমাদেরও শিখিয়ে দাও ভালো ক'রে। তার পর তোমার মত বেরোব টিউশানিতে। তিন গুণ টাকা আসবে ঘরে।'

মনোরমা মাঝে-মাঝে ধমক দেন, 'কি যে তোরা আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনা করিস, তোরাই জানিস। এত স্ফূর্তি যে তোদের কি দেখে আসে তাই ভাবি। বাছা আমার হাসপাতালে ভুগছে আর বাড়িতে তোরা দিব্যি গান-বাজানায় আনন্দ-সোহাগে দিন কাটাচ্ছিস্। যে শোনে সেইতো অবাক্ হয়ে যায়।'

বেদনায় নীলিমাও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার পর ঘরে এসে তাকায় দেয়ালে টাঙানো স্বামীর ফটোখানার দিকে। মনে অদ্ভুত বল পায় নীলিমা, মুখে হাসির আভাস দেখা দেয়। যে যাই বলুক কিছুতেই কিছু এসে যাবে না তার। সে তো জানে এই আমোদ-আহ্লাদ কিসের জন্য। তার বিদ্যা আজ কোন কাজে লাগছে, কি ভাবে সার্থক হ'তে চলেছে সে তো জানে, সুবিমল তো জানে।

'জানো তো? না তুমিও জানো না?'

ফটোখানাকে জিজ্ঞাসা করে নিলিমা। জবাব শোনবার জন্য দেয়াল থেকে সেখানা পেড়ে নিয়ে এসে অধীর আবেগে নিজের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে।

রায় সাহেবের ছেলে পুরন্দর একদিন সেতার বাজিয়ে শোনাল সবাইকে।

অঞ্জু বলল, 'আমাদের নীল মাসিও বাজাতে জানেন বাবা। সেদিন তোমার সেতার নিয়ে—

পুরন্দর বলল, 'তাই না কি। আপনার যে এমন চুরি করার অভ্যাস আছে তা তো আগে বলেননি।'

নীলিমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'বলবার মত কিছু নয়।'

পুরন্দর বলল, 'সে কথা ঠিক। চুরি কেউ বলে-কয়ে করে না। কিন্তু ধরাই যখন প'ড়ে গেছেন তখন তো একটু না শুনিয়ে পারবেন না।'

নীলিমা ভারি বিব্রত হয়ে পড়ল, 'বিশ্বাস করুন, সত্যি কিছু জানিনে আমি।'

পুরন্দর নীলিমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, 'আপনার অতখানি অনভিজ্ঞতা বিশ্বাস করা সত্যি শক্ত।'

নীলিমা বলল, 'সেটা আপনার বিশ্বাস করার শক্তির ওপর নির্ভর করে। ছেলেবেলায় একবার সুরু করেছিলাম, তারপর আর হয়ে উঠল না।'

পুরন্দর বলল, 'বেশ তো এবার হবে! তখন সুরু করেছিলেন, এখন শেষ করবেন। আমাদের ওস্তাদজী নারায়ণ ত্রিবেদীর সঙ্গে তো আপনারও পরিচয় হয়েছে, তাঁর কাছেই তো শেখার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারেন।'

নীলিমা বলল, 'এক একবার অবশ্য এ কথা আমিও ভেবেছি। সেতারের ট্যুইশানে শুনেছি টাকাও বেশি পাওয়া যায়।'

পুরন্দর আহত হয়ে বলল, 'টাকা! ও ভারি দুঃখিত। ওকথা আমার মনে ছিল না।'

জবাবে নীলিমা মৃদু একটু হাসল। তার মনে না থাকলে চলবে কি ক'রে।

বহু অনুরোধ উপরোধেও নীলিমা সে দিন সেতারে হাত দিল না। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে ট্রামে পুরন্দরের পরামর্শটা তার কেবলি মনে পড়তে লাগল। সেতার শিখবার সত্যিই ভারি সাধ ছিল তখন। কিছু দিনের জন্য এক জন সৌখীন অল্পবয়সী স্বামি-স্ত্রী নীলিমাদের বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। তাঁদের ছিল একটি সেতার। নীলিমা সেই বউটির কাছে সবে শিখতে সুরু ক'রেছিল। হঠাৎ এক দিন ওদের সঙ্গে কলের জল নিয়ে দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল নীলিমাদের। তাঁরাও রাগ ক'রে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন চ'লে গেলেন। তারপর নীলিমা অনেক চেষ্টা ক'রেছে সেতার শেখার জন্য, কিন্তু কিছুতেই সুযোগ হয়ে ওঠেনি। মা অসুখে পড়লেন, বাবার পুরোনো ভালো চাকরিটা গেল, কম মাইনের নতুন এক অফিসে ঢুকতে হোল তাঁকে। সেতারের কথা কি ক'রে আর মনে রাখে নীলিমা?

ছাত্রীদের গান শেখাতে এসে আবার চোখে পড়ল সেই সেতার। বাজাতে দেখল অঞ্জু-মঞ্জুকে। কয়েক দিন রইল লোভ সম্বরণ ক'রে শেষে এক দিন হাত দিয়ে বসল যন্ত্রে। আঙুলের ছোঁয়ায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল তার, তার চেয়েও বেশি ঝঙ্কার লাগল নীলিমার হৃদয়ে।

কৃষ্ণা আর কাবেরী উদ্বেলিত হয়ে উঠল, 'ও মা, দেখ এসে। নীল মাসী—'

সেতার রেখে নীলিমা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল, 'চুপ, চুপ।'

মাঝখানে দু'তিন দিন গিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রে এল নীলিমা। তারপর নতুন ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখে গিয়ে বলল, 'হাত পাতো।'

সুবিমল অনুমান করল জিনিসটা, তবু বলল, 'হাত কি আজ এই প্রথম পাতব?'

নীলিমা বলল, 'প্রথম ছাড়া কি। তোমরা কি কিছু পাততে জানো? হৃদয়ও আমরা পাতি, হাতও আমরা পাতি।'

তিনখানা নতুন দশ টাকার নোট ব্লাউজের ভিতর থেকে বের ক'রে স্বামীর হাতে নীলিমা গুঁজে দিল। আঙুলে আঙুলে মেশামেশি ক'রে রইল খানিকক্ষণ। ঝঙ্কারটা সেতারের চেয়ে কম হোল না।

নীলিমা বলল 'পুরস্কার দেবে না?'

সুবিমল বলল, 'দেব। ডক্টর কর বললেন, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি। মাস তিনেকের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাব।' একটু থেমে সুবিমল স্ত্রীর আনন্দ-উচ্ছল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অন্য কোন পুরস্কার তো এখন আর হাতে নেই।'

নীলিমা বলল, 'মনে থাকলেই হবে।'

প্রথম প্রথম কিছু দিন বার-তের বছরের দেবর সুকোমল আসত নীলিমার সঙ্গে। রায় সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি এসে ফিরে যেত। ফেরার পথে আবার এসে দাঁড়াত ট্রাম-ষ্টপেজটার কাছে। দিন কয়েক

পরে নীলিমা তাকে রেহাই দিল। বলল, 'থাক, আর তোমাকে পথ দেখাতে হবে না সুকু। তুমি তোমার পড়া করো গিয়ে!'

সুকু বলল, 'ভয় ক'রবে না তো বউদি? হারিয়ে যাবে না তো?'

নীলিমা সস্নেহে দেবরের গাল দুটি টিপে জবাব দিয়েছিল, 'না গো না, হারাই-ই যদি, খুঁজবার লোক তো আমার রইল।'

গান শিখিয়ে ফেরবার সময় নীলিমাকে পুরন্দর আজ বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিল, বলল, 'ত্রিবেদীজীকে আমি বলেছিলাম। তিনি রাজী হয়েছেন।'

নীলিমা একটু হাসল, 'কিন্তু আমি যে রাজী হব একথা আপনি কি ক'রে জানলেন?'

পুরন্দর বলল, 'রাজী হ'লেই তো লাভ। না হয়ে লাভ কি।'

নীলিমা বলল, 'আপাতত দেখছি তো লোকসান। অত গুরুদক্ষিণা কোথায় পাব।'

পুরন্দর বলতে যাচ্ছিল, 'সে জন্য ভাবেন না'। 'কথাটা তাড়াতাড়ি বদলে নিয়ে বলল, 'সকলের কাছ থেকে দক্ষিণা তিনি নেন না। তা ছাড়া আপনার কথা আমি তাঁকে সব বলেওছি।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু যেখানে গুরু হয়ে যাচ্ছি, সেখানে শিষ্য হয়ে গেল ছাত্রীদের কাছে মান যাবে যে।'

পুরন্দর বলল, 'ছাত্রীদের বাড়িতে কেন। আপনাকে একেবারে খোদ গুরুপাটে নিয়ে উপস্থিত ক'রব। তা'হলে তো আর কোন আপত্তি থাকবে না।'

নীলিমা ট্রামে উঠতে উঠতে বলল, 'আচ্ছা, ভেবে দেখব আপনার কথা।'

পুরন্দর বলল, 'আমার পক্ষে এইটুকু আশ্বাসই যথেষ্ট।'

নীলিমা ভালো ক'রে ভেবে দেখল। এই সুযোগে সেতারটা শিখে নিতে পারলে সত্যিই মন্দ হয় না। বাজনা জানা থাকলে টুইশানিতে আরো বেশি টাকা পাওয়া যায়। আর টাকার তো এখনো কত দরকার। সংসারে কিছু দিতে হবে। না হ'লে শ্বশুর মনে ক'রবেন কি? স্বামী যদি উপার্জনের সমস্ত টাকা তার জন্য ব্যয় ক'রতেন তখন শ্বশুর-শাশুড়ী যা ভাবতেন এখনো প্রায় তাই-ই ভাববেন। তা ছাড়া তিন মাস পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে সুবিমলকে কি কলকাতার এই বদ্ধ গলির মধ্যে ভ'রে রাখবে না কি নীলিমা। অন্তত দু'-এক মাসের জন্যও ভালো কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। আর সেই চেঞ্জের টাকা এই ভাবেই সংগ্রহ ক'রতে হবে নীলিমাকে। কেবল গলায় আর হারমনিয়মে সে টাকা উঠবে না, তার জন্য সেতারও দরকার।

নারায়ণ ত্রিবেদীর বয়স ষাটের কাছাকাছি, বয়সের অনুপাতে শরীর বেশ শক্তই আছে। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, ঋজু উন্নত চেহারা। মুখে শান্ত প্রসন্নতা। শোনা যায় অনেক শোক-তাপ পেয়েছেন জীবনে। পুত্র-কন্যার অকালমৃত্যু হয়েছে, নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রী সম্বন্ধেও নানা রকম কিংবদন্তী আছে। কিন্তু সে ইতিহাস লোকের চোখের সামনে তিনি ধরে রাখেননি। নিজের অন্তরের মধ্যেই তা তিনি প্রচ্ছন্ন

রেখেছেন। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে সেতারের আলাপে কেবল তার আভাস পাওয়া যায়। অন্য কোন আলাপ-আলোচনায় তা ধরা যায় না।

প্রৌঢ়া একটি বালবিধবা বোনকে নিয়ে তিনি থাকেন হরীশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের পুরোনো একতালা একখানা বাড়িতে। পুরন্দর নীলিমাকে এক দিন বিকালে নিয়ে এল সেখানে।

নীলিমা পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রলে ত্রিবেদী স্মিত মুখে আশীর্বাদ জানালেন, বললেন, কোন ভাবনা নেই। সব তিনি শুনেছেন।

নীলিমা বিদ্যাভাস আরম্ভ করল। টুইশানিতে আসবার আগে আসে এখানে। কিছুক্ষণ বসে বসে বাজায়; ত্রিবেদী চেয়ে চেয়ে দেখেন। মাঝে-মাঝে কেবল হেসে মাথা নাড়েন, হোল না।

অদ্ভুত ধৈর্য্য। কোন বিরক্তি নেই, তিরস্কার ভৎর্সনার আভাস নেই। এমন সহিষ্ণুতা সাধারণত দেখা যায় না।

কিন্তু ধৈর্য নেই নীলিমার নিজের। প্রায়ই প্রশ্ন করে আর কত দিন বাকি। কত দিনে অন্তত কাজ চালাবার মত বিদ্যাটা আয়ত্তে আসবে। টাকা রোজগার করতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীকে শিখিয়ে।

ত্রীবেদী হাসেন, বলেন, 'যা আনন্দের জিনিষ তাকে তুমি এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনে লাগাতে চাচ্ছ। আনন্দকে ছাপিয়ে প্রয়োজন তো এক দিন বড় হয়ে উঠবেই, কিন্তু তা আজই কেন?'

নীলিমা চুপ ক'রে থাকে। তিরস্কারের জন্য দুঃখ করে না। ত্রিবেদী কি করে বুঝবেন তার প্রয়োজনের কথা, যার সঙ্গে আনন্দের কোন ভেদ নেই কিংবা যা আনন্দের চেয়েও অনেক বড়।

অনেক ইতস্তত ক'রে নীলিমা কিছু টাকা ধার চাইল পুরন্দরের কাছে। একটা সেতার কিনবে বলে। পরে শোধ করবে।

পুরন্দর জবাব দিল, 'ভুল করেছেন, আমি মহাজন নই। নিতান্তই অভাজন মাত্র। টাকা নেই। তবে একটা জিনিষ আছে সেটা ধার দিলেও দিতে পারি।' বলে পুরন্দর একটু হাসল।

নীলিমা শঙ্কিত হয়ে উঠল, পাছে পুরন্দর বেফাঁস কিছু বলে ফেলে।

পুরন্দর তার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ভয় করবেন না, হৃদয় নয়। তেমন বাজে অকেজো জিনিষ রাখবার মত বাড়তি জায়গা আপনার নেই তা জানি। সে সব কিছু নয়। আমার সেতারটাই নিন্, আপনার কাজে লাগবে।'

নীলিমা কিছুক্ষণ মুখ নীচু ক'রে রইল তারপর বলল, 'আচ্ছা।'

কিন্তু এর পর এ টিউশানি রাখতে আর সাহস ক'রল না নীলিমা। ইতিমধ্যে আরো দুটি টিউশানির খোঁজ এসেছিল। নিজেই একটু অগ্রসর হয়ে সে দুটিকে নিয়ে নিল। কিন্তু সেতারটা পুরন্দরকে ফিরিয়ে দিতে চক্ষুলজ্জায় বাধল। সেটা রয়ে গেল নিজের কাজেই।

নীলিমা সুবিমলকে গিয়ে একদিন বলে আসল তার চেঞ্জের পরিকল্পনার কথা।

সুবিমল হেসে বলল, 'বেশ তো।'

না, বেশ তো নয়। সুবিমলকে সত্যি সত্যি নীলিমা দেখিয়ে দেবে তার সাধ্যের সীমা কতখানি। খুঁজে খুঁজে নীলিমা সেতারের টিউশানিও নিল। চেষ্টা ক'রল রেডিয়োতে। প্রোগ্রাম-ডিরেক্টর বললেন, 'কিন্তু আমরা তো নতুন শিক্ষার্থীদের তেমন সুযোগ দিতে পারিনে, টাকা দেওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না।'

নীলিমা অম্লান মুখে বলল, 'কিন্তু আমার কথা শুনলে আপনি 'না' করতে পারবেন না।'

প্রোগ্রাম-ডিরেক্টর শুনলেন এবং সত্যিই আর 'না' করলেন না।

অদ্ভুত উত্তেজনায় পেয়ে বসল নীলিমাকে। স্বামীর জন্য শুধু হাসপাতালের খরচই নয় তার চেঞ্জের টাকাও সংগ্রহ ক'রতে হবে। যত্র তত্র সে গান শেখাতে লাগল। সেতার শেখাতে গিয়ে কোন কোন জায়গায় অপদস্থও হোল, তবু হটল না।

নারায়ণ ত্রিবেদী বললেন, 'অত অধীর হয়ো না মা। অকালে শক্তির অমন অপচয় কোরো না। তাকে সঞ্চয় কোরো নিজের মধ্যে। ভবিষ্যতেও তার প্রয়োজন হবে।'

তিন মাসের পর আরো মাস দুই গেল। তারপর সুবিমলের সত্যিই ছাড়া পাবার দিন এল। দু'টি দিন মাত্র মধ্যে। এদিকে শ'-তিনেক টাকার মত প্রায় জমিয়ে তুলেছে নীলিমা। আর পঁচিশটা টাকা হ'লে সংখ্যা পূর্ণ হয়। আপাতত এতেই হবে। সুবিমল বাড়ি এলে টাকার তোড়াটা তাকে উপহার দেবে নীলিমা, বলবে, 'দেখ পেয়েছি কি না।'

পঁচিশটি টাকার কথা ভাবছে নীলিমা এই সময় আমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে এল উত্তর কলকাতার এক দল ছেলে। রঙমহল থিয়েটার হল্ ভাড়া নিয়ে তারা এক জলসার আয়োজন ক'রেছে। টাকাটা যাবে বন্যাপীড়িত দুর্গত-সেবার তহবিলে। সহরের বড় বড় সব শিল্পীরা আসবেন। তাঁদের সঙ্গে নীলিমারও ডাক পড়েছে।

নীলিমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'এঁদের মধ্যে আমাকে কেন। আমার কোন্ যোগত্য আছে।'

দলপতি গোছের কয়েকজন এগিয়ে এল, মধুর হেসে বলল, আছে বই কি। সেবার অধিকার তো সকলেরই। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে বিশেষ দাবীও আছে নীলিমার। সে নিজেকে যতখানি ছোট বলে মনে করে তা সে নয়।

এদের মধ্যে দু'-একজন রেডিয়োতে দেওয়া নীলিমার দু'-একটা গানের কথা উল্লেখ করল। কেউ কেউ বলল কোন কোন জলসায় তার সেতার না কি অদ্ভুত হয়েছিল শুনতে।

অদ্ভুত, হ্যাঁ অদ্ভুতই লাগল নীলিমার। প্রথম প্রথম স্বামীর রোগের কথা শুনে লোকে তাকে অনুকম্পা ক'রে টাকা দিয়েছে। মাঝে মাঝে একটু খোঁচা লাগত মনে, ক্রমে সেইটাই তার অভ্যাস হয়ে এসেছিল। যেখানে এ রকম বিশেষ পক্ষপাতিত্ব তার জুটত না, নৈপুণ্যের অভাব দেখে লোকে তাকে তুচ্ছ করত, অনাদর করত, সে সব জায়গায় নীলিমাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিত, বিদ্যায় তার দীনতা থাকলে কি হবে অন্তরে সে সমৃদ্ধ। সে টাকা তুলছে দুঃস্থ যক্ষ্মা-রোগগ্রস্থ স্বামীর জন্য, নিঃস্ব অর্দ্ধভুক্ত পরিবারের জন্য। তাতেও টাকাও আসত, নিজের শিল্পকুশলতার অভাবের জন্য ক্ষোভ এবং গ্লানিও কম হোত। মাঝে মাঝে উপরি পাওনা হিসাবে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশংসা অবশ্য এসেছে, কোন কোন মুহূর্তে গুন্‌গুন্ ক'রে গাওয়া পরিচিত গানের একটি কলি মনকে আচমকা দোলা দিয়ে গেছে; মনে হয়েছে এর সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না, সমস্ত কর্তব্য এর কাছে মিথ্যা, সকল উদ্দেশ্য এর কাছে

অর্থহীন। কিন্তু মনের এই মোহকে নীলিমা বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দেয়নি। আদর্শের পথে, কর্তব্যের পথে বাধা বলে বর্জন করেছ। তাছাড়া শুধু আদর্শ আর কর্তব্যই তো নয় হৃদয়ের দাবী, প্রেমের দাবী তার মনকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিছুতেই অন্যমনস্ক হ'তে দেয়নি।

কিন্তু আজ যখন ছোট হৃদয়ের আর ক্ষমতার মাপে মাপা ক্ষুদ্র সিদ্ধি তার করায়ত্তপ্রায় তখন আহ্বান এল বৃহত্তর জগতের। এল সার্থকতার নতুন অর্থ, মহত্তর সম্ভাবনা। নীলিমা শুনল, তার কৃতিত্ব আছে, নৈপুণ্য আছে, তার গান অনেকের সত্যি সত্যিই ভাল লেগেছে, তার সেতার অনুরণন জাগিয়েছে অনেকের মনেই। আর শুধু তাই নয় তার এই দক্ষতা আরও বড় কাজে লাগছে, ব্যাপকতর সেবায় ব্যয়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষাকরছে। সেখানে আসবেন দেশের বড় বড় শিল্পী, যাঁদের অনেকের সে কেবল নামমাত্র শুনেছে। তাঁদের সে আজ স্বচক্ষে দেখবে, গান শুনবে, গান শোনাবে।

উদ্যোক্তাদের কাছে সবিনয়ে সম্মতি জানাল নীলিমা। বলল, তার যোগ্যতা যদি সত্যিই কিছু থাকে তবে তা দেশের কাজে লেগে ধন্য হোক।

সুবিমল আসবে কাল বাড়ি। এক হাতে নীলিমা ঘর গুছাল, ঘর সাজালো, কিন্তু আর এক হাত রইল তার সেতারের তারে। ঘর-কন্নার ফাঁকে ফাঁকে সেতারে তুলতে লাগল তার সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত, তার শিল্পকুশলতার চরম নৈপুণ্য। কাল জগৎ তার যথার্থ পরিচয় পাবে। সে ছোট নয়, দীন নয়, অকৃতার্থ নয়।

পরদিন খানিকটা বেলা হ'তে না হতেই সুবিমল এসে পৌছল। বাড়িতে তার আগে থেকেই উৎসব সুরু হয়েছে। ভাইবোনদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। বাপ এলেন, রুক্ষ কঠিন তার মুখ, কিন্তু ভিতরের আনন্দ তবু যেন চাপা থাকছে না। মা এলেন গৃহদেবতা নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে, মনের আনন্দ চোখের জলে টলটল করছে। প্রতিবেশীরা এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন। কাছের বন্ধুরা খবর পেয়ে এল দেখা করতে।

এক ফাঁকে নীলিমাকে নির্জনে পেল সুবিমল, বলল, 'সবচেয়ে তোমার কৃতিত্ব বেশি।'

নীলিমা বলল, 'আস্তে, কেউ শুনে ফেলবে।'

সুবিমল হাসল, 'কারো যেন শোনার বাকি আছে। তার পর তোমার সেই টাকার তোড়া কই। সেই চেঞ্জে পাঠাবার তোড়া।

মন্ত্রগুপ্তি ঠিকমত রাখতে পারেনি নীলিমা। হাসপাতালে এক দিন কথায় কথায় খুসির ঢেউয়ে গোপন কথা ভেসে এসেছে।

নীলিমা মুখ ম্লান ক'রে বলল, 'তোড়া পূর্ণ হয়নি। গোটা-পঁচিশেক টাকা কম আছে।'

সুবিমল হাসল, 'মাত্র! কিন্তু তোড়া পূরাবার জন্য পঁচিশ টাকার চেয়েও বেশি দামী জিনিষ এখানে আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

কিন্তু দুপুরের পর বিকাল, বিকালের পর সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসতে লাগল নীলিমার মন ততই চঞ্চল হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে এক একবার সেতারের কাছে গেল, আবার ফিরে এল।

সুবিমল লক্ষ্য করে বলল, 'ব্যাপার কি।'

নীলিমা কুণ্ঠায় সংকোচে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'একটু বাইরে যেতে হবে।'

সুবিমলের মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে প'ড়ে যাওয়ায় হাসিমুখে বলল, 'ক্ষেপেছ, এত কাল বাদে আমি এলাম ঘরে আর তুমি যাবে বাইরে; টিউশানি-টানিতে আর কাজ নেই। তিনশো টাকায় ঘরে ব'সে দিব্যি তিন মাস খাব আর ঘুমোব।'

নীলিমা বলল, 'টিউশানি নয়।'

সুবিমল বলল, 'তবে কি জলসা-টলসা গোছের কিছু না কি। তার আর দরকার নেই। তারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনেছে নীলিমা বাঈজীর ভূতপূর্ব স্বামী ফিরে এসেছে যমের দুয়ার থেকে, যমের হাত থেকে যমদণ্ড কেড়ে নিয়ে। আজ কেবল একটিমাত্র জলসা হবে, কেবল তোমাতে আমাতে। তুমি গীত-সরস্বতী আর আমি গুণমুগ্ধ নারায়ণ। 'ধরো, এই নাও।' বলে নিজেই সুবিমল সেতারটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। তারপর মৃদু হেসে দোর দিল ভেজিয়ে।

নীলিমা কাতর স্বরে বলল, 'আজ থাক।'

সুবিমল বলল, 'না নীলিমা, আজই। রোগের বীজ আজ হয়তো চাপা আছে, কালই যে আবার ভেসে উঠবে না তার ঠিক কি? ডাক্তারের কথায় অত সহজে ভুলো না। তুমি বাজাও নীলিমা, আমি আজই একটু শুনব। তোমার সুর বেচে কেবল তুচ্ছ টাকাই এত দিন দিয়েছ, আজ এত অল্পতে ভোলাতে পারবে না। আজ তোমার সেই আসল সুর আমাকে শোনাতেই হবে।

কিন্তু সুবিমলের কথার মাঝখানে হঠাৎ এক সময় চমকে উঠল নীলিমা। কানে গেল সদর দরজার কড়া নড়ছে।

সেইদিকে কিছুক্ষণ কান পেতে রইল নীলিমা। নিজের সেতারের বাজনার চেয়েও যেন মধুর আর অপূর্ব ঐ কড়ানাড়ার নিক্কণ।

সুবিমল বলল, 'কি হোল, নাওনা সেতারটা।'

নীলিমা নিষ্প্রভ শূন্য দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর সেতারখানা টেনে নিল হাত বাড়িয়ে।' তাকে আজ বাজাতেই হবে।

পটক্ষেপ

রাগে আর অপমানে মুখখানা যেন ফেটে পড়ছে। ও যেন ষ্টুডিয়োতেই কাজ করছে। অস্থিরভাবে তেমনি পায়চারি করতে করতে শ্রীলতা বলল, 'তুমি যদি একটু সাহায্য করো তাহলে শোধ আমি এর তুলতে পারি।'

বললুম, 'সাহাষ্য করতে আমি রাজী কিন্তু শোধ সত্যি সত্যি তুমি কতটুকু তুলতে পারবে, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।'

শ্রীলতা বলল, 'নিজের সামর্থ্যের ওপর সন্দেহ থাকে তোমার থাক, কিন্তু আমার শক্তিকে অবিশ্বাস করোনা।'

মনে মনে হাসলুম, থিয়েটারে সিনেমায় আমার চেয়ে শ্রীলতার নাম ইদানীং একটু বেশিই ছড়িয়েছে। তার কারণ জাতে সে স্ত্রী, রূপ আছে চেহারায়, বয়স যদিও ত্রিশের কাছাকাছি তবু শরীরের বাঁধুনি ভালো থাকায় উনিশ কুড়িতে সে অনায়াসে নামাতে পারে। তাই নায়িকার ভূমিকা সে এখনো পায়, ষোড়শী কিশোরীর অংশে এখনো তাকে বেমানান দেখায় না।

আর এই কিঞ্চিদূর্ধ্ব চল্লিশেই আমি একটু বেশি বুড়িয়ে গেছি।

ওর বাপের কিংবা আর কোন অভিভাবকের ভূমিকাতেই নামবার সময় চুলে সামান্য কিছু সাদা রঙ মাখলেই চলে। কিন্তু মনের রঙ তবু মুছতে চায় না। অভিনয়ের মধ্যেও এই অকাল বার্ধক্যকে স্বীকার করে নিতে আমার কষ্ট হয়। ফলে ফাঁকে ফাঁকে অশোভন অসঙ্গত চটুলতা ধরা পড়ে। বিদুর কি যুধিষ্ঠিরের ভূমিকাতেও এক একদিন কীচকের মত্ততা প্রকাশ পেয়ে যায়। কর্তৃপক্ষকে বলি যে আসলে হয়তো ভালো লোক ব'লেই ভালো লোকের অভিনয় আমার দ্বারা হয় না। কিন্তু সে কথা তাঁরাও বিশ্বাস করেন না দর্শকেরাও না।

অথচ শ্রীলতাকে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। উল্টাডিঙ্গির নিতান্ত অখ্যাত এক পল্লীতে একটা গ্যাস পোষ্টের আড়ালে শ্রীলতা সেদিন দাঁড়িয়েছিল। সেদিন সেই ম্লান আলোয় প্রতিভা অবশ্য ওর মুখে তখনো দেখিনি, কিন্তু রূপ দেখতে পেয়েছিলাম।

আজ চাকাটা ঘুরেছে। স্বরূপ চিনেছে শ্রীলতা। আমার চেয়ে তাই আত্মবিশ্বাস ওর বেশি।

অপমানটা আমাদের ক'রে গেছে হিতাংশু। আমারই আপন মামাত ভাই, কিন্তু পরিচয়টা আজকাল মামাও দেন না, হিতাংশুও সহজে দিতে চায় না। মামা নামজাদা ডাক্তার। হিতাংশু এতদিন খ্যাতনামা ছাত্র ছিল, সম্প্রতি কি একটা সরকারী অফিসে ভাল চাকরী পেয়েছে। ইদানীং কি একটা সঙ্ঘেরও অধিপতি। তাতে ডাক পড়েছে অভিনেতাদের। সেই আমন্ত্রণ নিয়েই হিতাংশু এসেছিল।

ষ্টুডিয়োতে এই সেদিন বইটা শেষ হয়েছে। মধ্য সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে মঞ্চেও আজ আর নামতে হয়নি। দয়া ক'রে বন্ধু বান্ধব অনুপস্থিত। প্রমোদটি বহুকাল পরে শ্রীলতার সঙ্গে আজ জমেছিল।

সেই সময় হিতাংশুর কার্ড নিয়ে এল বেয়ারা, বিস্মিত হলুম। কেননা হিতাংশুর সঙ্গে যা আমার সম্পর্ক তাতে কোন কারণেই এখানে আসবার ওর কথা নয়।

বললুম 'শ্রীলতা, তুমি আড়ালে যাও।'

শ্রীলতার তখন ঘোর লেগেছে, বলল, 'পর্দার ওপরে থাকাই আমার অভ্যাস, আড়ালে কেন যাব। আমাকে পর্দানসীন করতে চাও না কি শেষ পর্যন্ত। করতো পরে কোরো। তার আগে দেখি তোমাদের ঋষ্যশৃঙ্গকে।'

হিতাংশু ঘরে ঢুকেই এক পা পিছিয়ে গেল, যেন ভয়ানক একটা খারাপ জায়গায় ঢুকতে যাচ্ছিল। আমি উঠে এগিয়ে গেলাম, 'এসো হিতাংশু।' নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই হিতাংশু হয়তো নাকে রুমাল চাপতে পারল না, কিন্তু মুখটা ঈষৎ বাঁকিয়ে নিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বলল, 'আমি না হয় আরেক দিন আসব সোমনাথ দা।' হেসে বললুম, 'আরেকদিন তো আসবেই। কিন্তু আজকের আসাটাকেই বা এমন ব্যর্থ ক'রে দেবে কেন, বছরদশেক পরে দেখা যখন আজ হয়েই গেল, তখন একটু না হয় বসেই যাও।'

হাত ধরে টেনে আনলুম শ্রীলতার সামনের সোফায়, পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললুম 'ইনি শ্রীলতা। কমলাক্ষীর নাম ভূমিকায় দেশীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে ইতি তৃতীয় স্থান দখল করেছেন।'

হিতাংশু স্বল্প একটু হাসল, ছোট্ট একটু নমস্কার করল, তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বেশিক্ষণ বসবার আজ সময় নেই। আপনি শনিবার সাড়ে ছয়টায় আমাদের সঙ্ঘে উপস্থিত থাকলে

খুসি হব। এই নিন কার্ড, আমাদের সঙ্ঘের নাম এবং উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই শুনেছেন।' আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'কিছুমাত্র না।'

হিতাংশু মুখ লাল ক'রে বলল 'কেন কাগজ কি আপনারা পড়েন না?'

'মাঝে মাঝে পড়ি।'

'মাঝে মাঝে! দেশের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে আপনাদের যোগ এত কম বলেই আমাদের শিল্প এমন পিছিয়ে পড়েছে। মহৎ জীবন না হলে মহৎশিল্প সৃষ্টি কি করে সম্ভব হবে।'

হেসে বললুম, 'তাতো বলতে পারি না হিতাংশু, কেবল এইটুকু জানি মদ যেদিন বেশি খেয়ে যাই সেদিনই পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকায় জমাতে পারি বেশি।'

হিতাংশু হাসল, 'আজও আপনি একটু বেশি জমে রয়েছেন ব'লে মনে হচ্ছে, আচ্ছা এ সম্বন্ধে আলোচনাটা প্রকাশ্য অধিবেশনই করা যাবে। দয়া করে যাবেন কিন্তু।'

হিতাংশু চলে গেলে শ্রীলতা বলল, 'তোমার ঋষ্যশৃঙ্গ নিশ্চয়ই আমার নামও শোনেনি, অভিনয়ও দেখেনি, না হ'লে তোমার চেয়ে নিমন্ত্রণটা আমারই বোধ হয় বেশি প্রাপ্য ছিল।'

বললুম, 'বাঙলা দেশের কেবল অভিনেতাদেরই ওরা ডেকেছে। নাটকটা বোধ হয় স্ত্রী ভূমিকা-বর্জিত, তা ছাড়া আমার এই সামান্য সম্মানে তুমি এত ঈর্ষা করছ কেন। তোমার গৌরবভার বয়ে বয়ে আমি অকালে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম আর আমার ক্ষীণতম গৌরব তোমার এমন অসহনীয় লাগছে? আমি কি এতই পর?'

শ্রীলতা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ঢং কোরো না, তুমি কি সত্যিই যাবে না কি ওখানে?'

আমি হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললুম 'রাম বলো।'

অবশ্য কেবল শ্রীলতার নিষেধই নয়। না যাওয়ার ব্যক্তিগত আরও একটু কারণ ছিল।

বাপ মা অল্প বয়সেই মারা গিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন। সাত আট বছর বয়স থেকে মামা বাড়িতেই মানুষ। তখন তিনি কেবল প্র্যাকটিস সুরু ক'রছেন। বাড়িতে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সদ্য বিবাহিত দম্পত্তির মনে তখনো বাৎসল্যের আবির্ভাব হয়নি। তবু তাঁদের মাঝখানে আমার ভূমিকাও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। প্রণয় কলহে পরস্পরের মধ্যে যখন কথা বন্ধ থাকত আমাকে করতেন ট্রানস্‌মিটার। ওপর থেকে নিচে টুকরো টুকরো চিঠি নিয়ে যেতাম, নির্ভুল বিনিময় করতাম সাঙ্কেতিক শব্দগুলির সেই বয়সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাঁজ করা রঙীণ কাগজের টুকরোগুলি দেখতাম খুলে। প্রথম ভাগ পড়া বিদ্যেয় জড়ানো লেখার প্রায় কিছুই পড়ে উঠতে পারতাম না, কিন্তু তার রঙটুকু তখন থেকেই যেন চোখে পড়তে সুরু ক'রেছিল।

তারপর হলো হিতাংশু, ও যত বাড়তে লাগল আমার মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন কর্পূরের মত ক্ষয় হতে লাগল। তাও সইল কিন্তু একদিন মামী-মা আবিষ্কার করলেন আমি হিতাংশুকে দেখতে পারি না তাকে হিংসা করি, গলাটিপে তাকে মেরে ফেলতে চাই। ফলে সন্দেহ সতর্ক দৃষ্টির বেড়ায় ও রইল ঘেরা নিচের ঘর থেকে ওর দোতলার ঘরে আমার যাওয়ার অধিকার রইল না। কেননা চাকরদের সঙ্গে

আমাকে একদিন বিড়ি খেতে দেখেছেন মামীমা। অতঃপর এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটি দেশলাই হিতাংশুর বইপত্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে এলাম। সে বিড়ির বাণ্ডিল মামীমার হাত থেকে মামার হাতে এসে পৌছল। নিঃশব্দে সহ্য করলাম তিরস্কার আর কাণমলা।

আর একদিন দেখা গেল হিতাংশুর টেবিলের ওপর যে রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের ছোট ছোট দুখানি ফটো রয়েছে বাঁধানো, তার পাশে একটি অনাবৃত ফরাসী অভিনেত্রীর প্রতিকৃতি। মৃদু কাণমলা চটি জুতায় উত্তীর্ণ হোল, আমিও চললুম পাল্লা দিয়ে।

তামাক থেকে মদে গিয়ে পৌছলাম, মদ থেকে মদীরাক্ষীতে। মামার কনিষ্ঠ কম্পাউণ্ডার বিষ্ণুবাবু, প্রথম দীক্ষা দিলেন। আমিও ছোট বড় অনেককেই দীক্ষিত করলুম কিন্তু হিতাংশুকে ছুঁতে পারলাম না, ও আমাকে উপদেশ দিল, অনুকম্পা করল, কিছুতেই কাছে ঘেঁষল না।

মামীমা তারস্বরে বলতে লাগলেন, 'তাড়াও তাড়াও, ও আমার সর্বনাশ করে তবে যাবে, এর পরেও যদি বেশি মায়া থাকে ভাগ্নের ওপর হোষ্টেল বোর্ডিংএ দাও কিন্তু আমার বাড়িতে আর নয়।' হোষ্টেল বোর্ডিংএও টিকতে পারলুম না। সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মামীমার চেয়েও বেশি পিওরিটান, মামাকে দিনের পর দিন রিপোর্ট করতে লাগলেন। মামা রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার মুখ আর আমি দেখতে চাইনে। এক পয়সাও তোমাকে আর আমি দিতে পারব না।'

মুখ আর দেখালাম না। বার দুয়েক আই-এ ফেল ক'রে তৃতীয়-বারের জন্য বিরক্ত এবং নিরাসক্তভাবে বইপত্র নাড়াচাড়া সুরু

ক'রেছিলাম, দিলাম ছেড়ে। এক মার্চেন্ট অফিসে চল্লিশ টাকার চাকরি জোগাড় করা গেল, তারপর চলল অবাধ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, চল্লিশ লক্ষ টাকাতেও অন্য কারো পক্ষে যা সম্ভব হোত না।

কিন্তু হিতাংশুর ওপর লোভ আমার রয়েই গেল। ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে ডিগ্রীর পর ডিগ্রী নিয়ে চলল। সহর ভরে ছড়িয়ে পড়ল ওর খ্যাতি। বিড়ি আর ফরাসী অভিনেত্রী ওকে ছুঁতেও পারল না।

ট্রামে বাসে পথে পার্কে মাঝে মাঝে দেখা হোত ওর সঙ্গে। কথা বলতে বলতে চুপ ক'রে যেতাম, ওর চোখে অনুকম্পা আর কৌতুক। মুখে মোহমুদ্গরের শ্লোক। আমাকে হাসতে দেখে ও আরো গম্ভীর হোত—কঠিন হয়ে উঠত। আর কিছুই ওকে স্পর্শ করতে পারত না, হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, স্নেহ পর্যন্ত নয়।

সেই হিতাংশু আজ আমার বাড়িতে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে এসে হাজির হয়েছে। বাড়ি অবশ্য এখন আর আমার নয়, শ্রীলতার। কিন্তু দিয়েছি তো আমিই অবশ্য দেওয়ার কৃতিত্বের চেয়ে কৃতার্থতা বেশি। দিতে চেয়েছিল অনেকেই কিন্তু নিয়েছে শ্রীলতা আমার কাছ থেকে।

হিতাংশুর আজ আর ভয় নেই, আমার সংস্পর্শে চরিত্র হারাবার আর আশঙ্কা নেই তার, আমাকে আজ সে উন্নীত করতে এসেছে জনসমাজের সঙ্গে—শিল্পী রসিক গুণীজনের সঙ্গে আমার পরিচয় আর প্রতিষ্ঠা সে আরো ব্যাপকতর ক'রে দেবে। কিন্তু যে আমার স্নেহকে পর্যন্ত ঘৃণায় ফিরিয়ে দিল তার দাক্ষিণ্য আর শুভেচ্ছাকে আমি নিতে যাব কোন লজ্জায়।

শ্রীলতাকে বললুম, 'রাজী আছি তোমাকে সাহায্য করতে'।

হিতাংশুদের প্রকাশ্য অধিবেশনে গেলাম না, শ্রীলতার সঙ্গে গোপন অধিবেশনের আয়োজন চলতে লাগল।

দিন কয়েক বাদে চিঠি গেল হিতাংশুর নামে। শ্রীলতার প্যাডে শ্রীলতারই লতানো হাতের লেখায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য হিতাংশুর দাদা যে যেতে পারেননি সেজন্য শ্রীলতাই লজ্জিত হয়েছে বেশি। হিতাংশু তাতে যেন ক্ষুব্ধ না হয়। আমাদের দেশে ওই ধরণের সম্মেলনে শ্রীলতাদের উপস্থিত থাকবার ভাগ্য এখনো হয়নি। তার জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। কিন্তু তার আগে গভীর কুণ্ঠায় পরম সঙ্কোচে শ্রীলতা একটি প্রশ্ন করবার স্পর্ধা জানাচ্ছে—তার আগে হিতাংশু কি অনুগ্রহ ক'রে আর একবার এখানে পদধূলি দিতে পারেন না, নির্ধারণের চেষ্টা করা যায় না মহৎ জীবনের সঙ্গে মহৎ শিল্পের সত্যিকারের সম্পর্কটা কি?

দিন কয়েক নীরবে কাটল। তারপর এক পোষ্টকার্ড এল হিতাংশুর। সে আসছে। সন্ধ্যায় নয়, সামনের ছুটির দিনে সকালে।

সময় নির্বাচনের মধ্যে সে দিনের কি একটু ইঙ্গিত যেন ছিল, শ্রীলতার মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল দেখতে পেলাম।

সকালেই স্নান সারল শ্রীলতা। আঁচলের ফাঁকে ভেজা চুল ছড়িয়ে রইল পিঠের ওপরে। চাওড়া লাল পেড়ে সাধারণ শাড়ী মাত্র পরনে। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা পড়ল, কপালে ছোট ক'রে ফোঁটা। পায়ে আলতার ক্ষীণ দাগ, যেন সকালের রোদে গলে গেছে, শিশিরে গেছে ধুয়ে।

বললুম, 'বড় বেশী বাড়াবাড়ি হোল। একেবারে উর্ব্বশী থেকে গৃহলক্ষ্মী। আতিশয্যটা অচিরাৎ ধরা পড়বে।'

শ্রীলতা বলল, 'তুমি চুপ করো।'

আমি চুপ করলুম—শ্রীলতাই কথা বলতে লাগল।

নমস্কার বিনিময়ের পর হিতাংশু বলল—সে দিন অমন ক'রে হঠাৎ চ'লে যাওয়ার জন্য সে লজ্জিত। কিন্তু সত্যিই তার বড় তাড়া ছিল।

শ্রীলতা সেদিনের কথা স্মরণ ক'রে লজ্জায় মুখ নামাল, কুণ্ঠিতভাবে বলল—'তাড়া না থাকলেও আপনাকে থাকতে বলবারসেদিন জোর ছিল না।'

আরক্ত মুখে হিতাংশু বলল—'সে কথা থাক।'

সে কথা রইল।

শ্রীলতা বলল—'এক কাপ চায়ে আপনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।'

হিতাংশু ইতস্ততঃ ক'রে বলল—'আপত্তির কি আছে। কিন্তু চা তো এইমাত্র খেয়ে এলাম।'

শ্রীলতা স্নিগ্ধ একটু হাসল—'তাতে কি হয়েছে। কেবল একটু চা তো, ওটা খেয়ে সবাই আসেন আবার এসেও সবাই খান।'

উৎকর্ণ হয়ে উঠলুম। অন্যের বানানো কথাই এতদিন শ্রীলতাকে মুখস্থ বলতে শুনেছি। কিন্তু নিজেও যে ও এমন বানিয়ে কথা বলতে পারে তাতো জানা ছিল না।

স্বহস্তে ট্রেতে ক'রে দু' কাপ চা নিয়ে এল শ্রীলতা। ফুটন্ত পদ্মের মত বড় বড় নীল রঙের দুটি কাপ, ভেতরে তরল তামাটে রঙের পানীয়।

একটি কাপ আমার চেয়ারের হাতলে নামিয়ে রাখল শ্রীলতা। দ্বিতীয়টি নিজে তুলে দিল হিতাংশুর হাতে। সামান্য একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। আর তাতেই শ্রীলতার সিঁথির সিঁন্দুর তার সমস্ত মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ল।

মনে মনে বললুম—'অপূর্ব। লজ্জার এমন অভিব্যক্তি কোন চতুর্দশী কিশোরীর পক্ষেও সম্ভব হোত না।' শিল্পে আতিশয্যকে ক্ষমা করি, কেননা অপ্রত্যাশিতকে পাই।

আড় চোখে তাকিয়ে দেখলুম সিঁন্দুর কেবল নিজের মুখেই শ্রীলতা ছড়ায়নি, তার ছাপও ফেলেছে আরেকজনের ওপর।

হিতাংশু বলল—'বা রে, কেবল আমাদেরই দিলেন, আপনি নিলেন না চা।'

শ্রীলতা হেসে বলল—'না, আমি চায়ের তত ভক্ত নই।'

হিতাংশু বলল—'কেবল অন্যদের বুঝি ভক্ত বানাতে চান।'

এবারো চমৎকৃত হলুম। সেই জ্যামিতি আর জীবনচরিত পড়া মুখচোরা হিতাংশু কথায় এমন ব্যঞ্জনা মাখাতে শিখল কবে। ভুলে গেলাম ব্যঞ্জনাটা চেষ্টা করে লাগাতে হয় না, একটা নির্দিষ্ট বয়সে হাসিতে কথায় ওটা আপনিই এসে লাগে।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম—'তারপর তোমাদের সম্মেলনের খবর কি হিতাংশু। সেদিন জমায়েৎটা বেশ আশানুরূপ হয়েছিল তো?'

হিতাংশু বলল—'হ্যাঁ, কেন হবে না। চেষ্টার তো আমরা ত্রুটি করিনে।'

হেসে বললুম—'চেষ্টার ত্রুটি না হলেই কি ফলটা সব সময় আশানুরূপ হয়? তা হ'লে বল আশাটাই তোমাদের ফলের অনুরূপ। ফল দেখে সেটা ওঠে আর নামে।'

হিতাংশু বলল—'তা নয়। ফল আশানুরূপ না হ'লেও আমরা হতাশ হইনে। সময়ের জন্য আমরা অপেক্ষা ক'রতে পারি।'

হঠাৎ হিতাংশু শ্রীলতাকে জিজ্ঞেস করল—'আপনি কি বলেন। তাই কি উচিত নয়?'

শ্রীলতা যেন একটু ঘাবড়ে গেল, বলল, 'নিশ্চয়ই, অপেক্ষা তো ক'রতেই হবে।'

হিতাংশু বলল—'না, শুধু অপেক্ষা করলেই চলবে না। কাজের মধ্য দিয়ে সময়কে এগিয়েও আনতে হবে। আমি ভেবেছি আমাদের পরের অধিবেশনে আপনাদেরও এরপর আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করব।'

শ্রীলতা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল—'না না, অত ব্যস্ত হবেন না। প্রথমেই অত তাড়াতাড়ি করতে গেলে ফল হয়তো খারাপ হবে।'

দেখলুম বিষয়গুলি শ্রীলতার অভ্যস্ত অংশের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আলোচনার মোড়টা ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার।

বললুম—'কিন্তু সেখানে গিয়ে এরা করবে কি?'

হিতাংশু বলল—'যোগ দেবেন আলোচনায়। সকলের কথা শুনবেন, বলবেন নিজেদের কথা।'

হেসে বললুম—'নিজেদের আবার কথা কি আছে। অন্যের কথা মুখস্থ ক'রে কোন্ ভঙ্গিতে কোন্ কৌশলে শ্রোতাদের শোনাতে হয় সে বিদ্যা এরা তো যথাস্থানেই দেখিয়ে থাকে।'

এরকম বিশ্বাসঘাতকতার কথা ছিল না।

দেখলুম শ্রীলতার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, বলল—'আমরা কি কেবল অন্যের কথা মুখস্থই বলি ?'

বললুম—'যখন বলো না, তখনই বিপদে ফেল।'

শ্রীলতা আরো চটে গেল, বলল—'হ্যাঁ, বিপদ এড়াবার জন্যই আমাদের দিয়ে কেবল তোমরা মুখস্থ করাও তা জানি। কিন্তু এটা জেনো, মুখস্থ করা কথা যখন সবাইকে শোনাই তখন তা একান্ত আমারই কথা, আর কারো নয়।'

হিতাংশু খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নেড়ে বলল—'ঠিক বলেছেন।'

জীবন আর শিল্পের আলোচনা সেদিন স্থগিত রইল। অন্যান্য দু' একটি কথাবার্তার পর হিতাংশু উঠে গেলে শ্রীলতাকে বললুম—'শাপে বর হোল। তোমাকে চটিয়ে দিয়ে ভালোই ক'রেছি। আসরটা প্রায় মিইয়ে এসেছিলে। গরম হয়ে ফের গরম ক'রে দিতে পেরেছ। আর একটু উষ্ণতার আশা রাখি।'

শ্রীলতা গম্ভীর মুখে বলল,—'না, এখন থাক।'

আরো দু' একটা উপলক্ষে হিতাংশুকে চিঠি লিখতে হোল। তারপর আর চিঠি লেখার দরকার হোল না। সে নিজেই বলল, 'যোগাযোগটি কেবল অনুষ্ঠানিক সভাসমিতিতে হবে না, তার জন্য আরও ঘনিষ্ঠভাবে এদের সঙ্গে এসে মিশতে হবে। আমাদের দেশের এই সব শিল্পীদের চিন্তার জড়তা, অভ্যাসের কুশ্রীতা নইলে দূর হবে না। আর জীবনকে সহজ সুন্দর নির্মল না করতে পারলে শিল্পও সার্থক হবে না, মহৎ হবে না'।

সুতরাং হিতাংশু আসতে লাগল, তার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দিতে লাগল শ্রীলতার। মনে মনে হাসলুম—এই তো চাই। স্বীকার করলুম শ্রীলতার কৃতিত্বকে। আমি যা পারিনি, তা সে পেরেছে। কিন্তু এই কৃতিত্বের ফলটা আমিও ভোগ করব। যথাসাধ্য সুযোগ দিতে লাগলাম, শ্রীলতাকে সাহায্য করতে লাগলাম। হিতাংশুর যখন আসবার কথা থাকে আমি তখন থাকি না। আশা করি, না চটেও শ্রীলতা তখন আসর জমিয়ে রাখতে পারে। কোনদিন এসে শুনি চলছে অভিনয় কলা সম্বন্ধে আলোচনা, কোনদিন বা সাহিত্যের কোনদিন বা রাজনীতির। নানারকমের বইপত্র শ্রীলতার টেবিলে জমতে থাকে, ভরতে থাকে শেলফের তাকগুলি। ইংরেজী শিখবার আগ্রহ তার দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

রেডিও থামিয়ে হিতাংশুর অনুরোধে মাঝে মাঝে গানও গায় শ্রীলতা তার যে সব পুরোন গান রেকর্ড থেকে রেডিয়োতে, রেডিয়ো থেকে সহরবাসীদের মুখে মুখে ফিরেছে সে সবের পুনরাবৃত্তির মধ্যে যেন নতুন সুর নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন প্রাণ এসে যোজিত হয়।

একেকবার সন্দিগ্ধ হয়ে তাকাই অভিনয়টা সত্যি কার সঙ্গে আরম্ভ করল শ্রীলতা। সহজে ধরা যায় না, সহজে ধরা দেয় না ওরা জাত অভিনেত্রী।

একেকবার ভাবি হিতাংশুকে এবার জিজ্ঞাসা করি আমাদের সঙ্গে হিতাংশু যে এখন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তাতে আমার শুচিবায়গ্রস্থ মামা মামী কি ভাবছেন, বলছেনই বা কি। না তাঁরাও রাতারাতি সমাজ সংস্কারক হয়ে উঠলেন। কিন্তু চেপে যাই। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। জিজ্ঞাসা করবার সময় তো আসছেই। বহু জিজ্ঞাসা যে ওর মনেও এসে ভিড় ক'রেছে তাও তো লক্ষ্য করছি।

কিন্তু শ্রীলতার হোল কি। কি পেল, কি এমন দেখল সে হিতাংশুর মধ্যে। অভিনয় নিয়ে এমন ক'রে মেতে উঠতে ওকে কখনো দেখিনি, আসল অভিনয়ে ওর অন্যমনস্কতা ধরা পড়ছে। ষ্টুডিয়োতে কাজ করতে করতে ওর চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলুম—'সত্যি সত্যিই শেষে প্রেমে প'ড়ে যাবে না কি? খবরদার, খবরদার।' শ্রীলতাও হাসে, 'ঘাবড়িয়ো না। তেমন বুঝলে আগেই জানিয়ে রাখব। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ধ'রে তুলতে পারবে।'

বছর সাতেক যাবৎ শ্রীলতার সঙ্গে আমার পরিচয়। দুজনেই দু'জনকে চিনি, কারো কাছেই নির্ভেজাল একনিষ্ঠতা আমরা প্রত্যাশা-ও করিনে দাবীও করিনে। কিন্তু উল্টো দিক থেকে শ্রীলতা যেন দিনের পর দিন একনিষ্ঠই হয়ে উঠেছে। কি পেয়েছে সে হিতাংশুর মধ্যে? এতদিন শিল্পী-জীবনের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার আর উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে জীবন-রহস্যের সম্বন্ধে যে অঙ্গাঙ্গী তাতে তার কোন সংশয় ছিল না। আজ কি তার ধারণা বদলেছে, রুচি বদলেছে? জীবনের সমস্ত রস, সমস্ত রহস্য সে খুঁজতে চেষ্টা করছে বিদ্বানের মধ্যে চরিত্রবানের মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের মধ্যে? আমি কি ঠ'কে যাচ্ছি? আমি কি প্রতারিত হচ্ছি?

কিন্তু প্রতারণা ওরা করল না। বছর খানেক পরে হিতাংশু পরিষ্কার ভাষায় বলল—শ্রীলতাকে সে বিয়ে করতে চায়। শ্রীলতার দিকে তাকালুম। সে তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল, ভাবলুম হয়তো হাসি গোপন ক'রে নিচ্ছে শ্রীলতা। হিতাংশুর ওপর দয়া হোল। এবার ওকে রেহাই দেওয়া উচিত।

হেসে বললুম—'কি বলছ হিতাংশু! চায়ের সঙ্গে তোমার বউদি বোধহয় পরিহাস ক'রে কিছু মিশিয়ে টিশিয়ে খাইয়েছেন?'

শ্রীলতা চমকে উঠল, বলল,—'কক্ষণো নয়।'

এবার আমার চমকাবার পালা।

তিক্ত হেসে বললুম—'মদের কথা বলছিনা। তা ছাড়াও তো মেশাবার মত আরো অনেক নেশার জিনিষ তোমাদের আছে। কিন্তু সে নেশাও চিরস্থায়ী নয়, তাও একদিন ভাঙবে। তখন কি উপায় হবে তোমার? তখন কি উপায় হবে হিতাংশুর?'

হিতাংশু বলল—'সে ভাবনা আমরাই ভাবব।'

বললুম—'চমৎকার। কিন্তু সম্প্রতি বোধ হয় আরো কিছু তোমাকে ভাবতে হবে হিতাংশু। তোমার মা বাবার কথা, সমাজের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা।'

চাকা ঘুরেছে। মোহমুদ্গার আওড়াবার ভার এবার আমার ওপর।

হিতাংশু আস্তে আস্তে বলল—'তার আগেও আপনার কথাই আমার ভাবা উচিত ছিল। ভাবিনি যে তাও নয়।'

হেসে উঠলুম—'সত্যি না কি? ভেবে বুঝি শেষ পর্যন্ত এই ঠিক করলে?'

হিতাংশু বলল—'হ্যাঁ। আপনার ছেলে মেয়ে আছে, স্ত্রী আছে—'

বললুম—'সুতরাং আমার এই বাড়তি উপস্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অধিকারও তোমার আছে। চমৎকার যুক্তি। তোমাদের সঙ্গে

পার্থক্য আমাদের এই—আমরা যখন বদমাস নির্ভেজাল বদমাস তথনো সমাজ সংস্কারের মুখোস আমরা প'রে থাকি না।'

হিতাংশু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বোধ হয় নিজেকে সংযত করে নিল, তারপর বলল—'আপনি হয়তো প্রকৃতিস্থ নেই।'

বললুম—'হয়তো তোমার চেয়ে অনেক বেশী প্রকৃতিস্থ আছি।'

শ্রীলতা শান্তভাবে আমার দিকে আস্তে আস্তে বলল 'তর্ক ক'রে কি লাভ।'

জবাবে অনেক কথা এসেছিল, কিন্তু সে কথা তুলে লাভ নেই, তর্ক ক'রে লাভ নেই সত্যিই। একথা শ্রীলতাকে আজ মনে করিয়ে দিতে যাওয়া ভুল যে আমিই তাকে প্রথম রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম, প্রতিষ্ঠিত ক'রে ছিলাম দশজনের মধ্যে। তার আজকের এই সমস্ত খ্যাতি সমস্ত প্রতিপত্তির মূলে ছিলাম আমিই। একথা শ্রীলতাকে মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। সে কথা থাক। সেই উপকারের কথা না হয় না-ই তুললাম, তার চেয়েও কি বড় কিছু করিনি। এই দীর্ঘ সাত আট বছর ধ'রে তাকে কি একটুও ভালোবাসিনি? সেই ভালোবাসায় সমাজের স্বীকৃতি অবশ্য ছিল না, ভবিষ্যৎকে মজবুত করবার জন্য আইনের বাঁধন কিছু ছিল না, তা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতার কি কোন মূল্যই নেই? এমন শান্ত নির্বিকারভাবে শ্রীলতা আজ বলতে পারল কোন লাভ নেই তর্ক ক'রে?

লাভ নেই তা ঠিকই। শ্রীলতা একাধিক কোম্পানীর সঙ্গে আজ চুক্তিবদ্ধ রয়েছে। তাতে বিচ্যুতি ঘটলে আইনগত নানা অসুবিধা

আছে; কিন্তু আমার সঙ্গে তার এই অলিখিত চুক্তি নিঃসংশয়ে সে ভাঙতে পারে। সমাজ কিংবা আইন তাকে স্পর্শ করবে না।

খবর পেয়ে মামা-মামী এলেন মোটরে। মামা বললেন, 'যদি একদিনের অন্নও আমার কাছে তুমি পেয়ে থাক ওকে ফেরাও।'

মামীমা হাসলেন, 'কাকে কি বলছ। ওই তো এসব ক'রেছে। ও তো এই চায়, এই চেয়েছিল।'

বললুম, 'এই চেয়েছিলাম।'

'তাছাড়া কি। ছেলেবেলা থেকে অনুক্ষণ তোমার তো এই চেষ্টাই ছিল। কিসে ওকে নষ্ট করবে। মনে নেই সেকথা? আজ পেরেছ। নিজের নাক কেটে পেরেছ আজ অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করতে।'

হিতাংশুকে ফেরান গেল না। শ্রীলতাকেও না। সাধারণ সহজ ভাবে আমি ওদের ফেরাতে চেষ্টাও করলুম না। শাসন তিরস্কারও নয়, অনুনয় বিনয়ও নয়। আমি ভেবে রেখেছি আমার পদ্ধতি। শ্রীলতাকে আমি হয়তো ফিরিয়ে নিতে পারব না, কিন্তু অতীতকে, কুশ্রী কলঙ্কমলিন অতীতকে, প্রণয়-মধুর, বেদনাভারাতুর অতীতকে বারংবার ওদের মধ্যে বয়ে নিয়ে যেতে পারব।

বিদায় দিলাম শ্রীলতাকে। বললুম, 'অভিনয়ের সময় অভিভাবক বা ব্যর্থপ্রেমিকের বেশে বহুবার তোমার নবপ্রণয়কে আশীর্বাদ ক'রেছি, অভিনন্দন জানিয়েছি। আজ আর তা করব না শ্রীলতা। আমি জানি আমার শুভেচ্ছা তোমার না হ'লেও চলবে।'

শ্রীলতা কথা বলল না, দুটো চোখ আজও ছলছল ক'রে উঠল।

কিন্তু এসব ব্যাপারে ওর অভ্যস্ততা তো দীর্ঘকালের। হেসে বললুম 'যাও, এই মুহূর্তে নাট্যকার আমার মুখে কোন কথা বসিয়ে

ন নি। আমার কিছু বলবারও নেই, করবারও নেই। অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবল হাসতে হবে।'

শ্রীলতা যেন একটু শিউরে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না কেন, তোমার আরো অনেক করবার রইল।'

হেসে বললুম, 'রইলই নাকি?'

শ্রীলতা আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামাল। বলল, 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে সাহায্য কোরো।'

কি রকম করে উঠল মনের মধ্যে। কিছু বলতে পারলুম না। জানি আজ এই সাহায্যের অর্থটা কি। কিন্তু শ্রীলতার গলার ওই কম্পনটুকুর মধ্যে অর্থাতীত কি আর কিছুই নেই?

কিন্তু

বললুম 'যা—.